সোভিয়েত ইউনিয়ন

নং২ (১২২)
১৯৭৮

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

দাঁড়া, দেখাচ্ছি! কয়েক সিরিজের কার্টুন ফিল্ম এটি. চিত্রনাট্য—ফ. কামোভ, আ. কুর্লিয়ান্দস্কি, আ. হাইত। পরিচালক কতেনচকিন, শিল্পী-প্রয়োজক—স. রুসাকভ।

এ ফিল্মে নায়ক দুজন—নেকড়ে আর খরগোস। খরগোসের পেছনে লেগে আছে নেকড়ে। সারাক্ষণ। খরগোস সর্বদাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করবে বলো।

এ ফিল্মের শেষ নেই। কী করে হবে? যদি খরগোসের পাল্লা ধরতে পারে নেকড়ে, তাহলে সে তাকে খাবে। সেটা নেকড়ের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু লেখকদের পক্ষে নয়। আর নেকড়ে একা, লেখক একাধিক, তাই অন্য ধরনের কাহিনীই তাদের পছন্দ।

এ ফিল্মে সংলাপ নেই। থাকা সম্ভব না। দৌড়তে দৌড়তে তো আর কথা বলা যায় না। শুধু শিকার যখন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সেই বিরল মুহূর্তেই নেকড়ে অসহায় রাগে চেঁচিয়ে উঠবে: 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'

১) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নেকড়ে। বড়ো বড়ো চোখ, দাঁতাল মুখ, খাই-খাই ভাব। বেলা হয়ে গেছে অনেক অথচ প্রাতরাশও সারা হয় নি।

২) টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে নিবে গেল সিগারেট। মাথা তুলে দেখে: 'ও হো, পুরনো বন্ধু।'

৩) কুলে বারান্দায় ফুলের টবে জল দিচ্ছে খরগোস। ধবধবে, নাদুসনুদুস, মিষ্টি-মিষ্টি, একেবারে জল আসে জিভে।

১) নদী তীরে গেল নেকড়ে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে, প্রকৃতির শোভা দেখলে, লেজের ঝাড়িতে হুরকুট করলে ফুল।

২) পথে দ্যাখে, বেড়া। বেড়ার গায়ে পোস্টার। পোস্টারে খরগোসের ছবি। দেখেই পিত্তি জ্বলে গেল নেকড়ের।

৩) 'এবার যদি তোকে দশ পা দূরে থেকে সোজাসুজি চালিয়ে দিই।'

১) তীরে এল নেকড়ে। দ্যাখে—গাছের নিচে শুয়ে আছে খরগোস, রোদ পোয়াচ্ছে।

২) গাছে উঠল নেকড়ে, ভালো করে বসে ফাঁস নামাতে লাগল খরগোসকে লক্ষ্য করে।

৩) খরগোস কিন্তু চোখ বুজে শুয়ে আছে। খুবানী খাচ্ছে। খেয়ে দেয়ে আঁটিটা দুই আঙুলে চাপতেই তা ছুটে গেল গুলির মতো।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

৪) একটা দড়ি জোগাড় করলে নেকড়ে, ফাঁস বানিয়ে ছুড়ে দিলে চিমনির ওপরে। দুই হাতে দড়ি বেয়ে ওঠে নেকড়ে, দু'পায়ে দেখায় কত কায়দা।

৫) খরগোশ ওদিকে কাঁচি দিয়ে শুকনো ডালপালা ছাঁটছিল। মাঝে, একটা দড়ি — দড়ি কেন আবার? চট করে কেটে দিলে।

৬) ধপ করে মাটিতে পড়ল নেকড়ে। আকাশের দিকে লোমশ মুঠো তুলে রেগে মেগে গর্জালে, 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি!'

৪) সোজাসুজিই চালিয়ে দিলে।

৫) সাবাস নেকড়ে! বাহবা! একেবারে লক্ষ্যভেদ। টান দিলে ত্রিশূলে। বেরয় না। টান দিলে আরো জোরে।

৬) গোটা বেড়াই ভেঙে গিয়ে চাপা পড়ল নেকড়ে। দাঁত কড়মড় করে গজরালে, 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি!'

৪) লাগল নেকড়ের কপালে। উলটে পড়ে আটকে গেল নেকড়ে নিজেরই ফাঁসে। মড়মড় করছে ডাল, এই বুঝি ভাঙে।

৫) নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতেই লোম খাড়া হয়ে উঠল নেকড়ের। খরগোশ চলে গেছে, তার জায়গায় সংসার পেতেছে সজারু।

৬) ভেঙে গেল ডাল, নেকড়ে পড়ল একেবারে সজারুদের কাঁটার ওপর। তাতে গায়েও যেমন যন্ত্রণা, মনেও তেমনি জ্বালা: 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি!'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!' ও তার রচয়িতারা

আমাদের পত্রিকা 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' কার্টুন ফিল্মের মুক্তিপ্রাপ্ত সবগুলো সিরিজের পরিচয় পাঠকদের দিয়েছে। প্রকাশিত উপাদানগুলি পাঠকমহলে বিরাট সাড়া জাগায়। ফিল্মের রচয়িতাদের ছবি প্রকাশের জন্য তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন।

ছবিতে শুটিংসংশ্লিষ্ট কর্মদলের একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে ডাইনে: শিল্পনির্দেশক স. রুসাকভ, সহকারী পরিচালক ইয়ে. তুরানভা, কার্টুন শিল্পী ও. কমারভ, পরিচালক ভ. কাতিওনচুকিন, ক. রুমিয়ানৎসা (ফিল্মে ইনিই খরগোশের গলায় কথা বলেন), প্রযোজক ফ. ইভানভ এবং নেকড়ে ও খরগোশের যাঁরা জন্ম দিয়েছেন তাঁদের একজন — চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দস্কি।

'আপনারা ছবির দশম সিরিজ তৈরি করছেন। তার মানে, আপনাদের জয়ন্তী!' আমরা ভ. কতিওনচুকিনকে বললাম।

'এমনকি বলতে গেলে একসঙ্গে দুটো জয়ন্তী: দশম সিরিজ বের হচ্ছে 'মুলৎফিল্ম' স্টুডিওর ৪০ বছর পূর্তির সময়।'

১) আগেই বলেছি যে টেলিভিশনের পর্দায় খরগোশকে দেখতে পেয়ে নেকড়ে তার খোঁজে টেলিভিশন স্টুডিওর দিকে ছুটল।

২) তারপর যা হল... নেকড়ে স্টুডিওর দরজা খুলতেই থ বনে গেল।

৩) জঙ্গী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বন্দুকধারী, আর টুপির তলা থেকে উঁকি মারছে খরগোশের কান। 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি!'

৪) নেকড়ে চুল্লি খোঁচানোর শিক বাগিয়ে ধরল, শুরু হয়ে গেল মরিয়া লড়াই।

৫) নেকড়ে খরগোশকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল, তলোয়ার এদিক-ওদিক করার কোন জায়গা নেই। কিন্তু খরগোশ হাল ছেড়ে দেবার পাত্রই নয়।

৬) কায়দা করে কড়িকাঠের দিকে লাফ মেরে উঠে সে লোহার বাতিটাকে ভেঙে ফেলল। বাতি সোজা এসে পড়ল নেকড়ের মাথায়!

'সোভএক্সপোর্তফিল্ম' অফিস থেকে জানতে পারলাম যে ৫০টি দেশে আপনাদের ফিল্ম দেখানো হয়েছে। নেকড়ে ও খরগোশ নিজেদের জনপ্রিয়তাকে কী চোখে দেখে?'

'নানারকমভাবে। যখন তারা সংবাদপত্রে পড়ে যে মহাকাশচারীরা বাইকনুর উৎক্ষেপণ ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে সচরাচর বাসে 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' দেখেন তখন তাদের ভালো লাগে। তারা জেনে খুশি হয় যে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' নামে কাফে খোলা হয়েছে। তবে যশের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকও আছে। শৌখিন শিল্পীদের আঁকা ছবি, ব্যাজ ও পোস্টকার্ডের হাতে পড়ে নেকড়ে ও খরগোশের চেহারা এমন দাঁড়ায় যে তারা অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারে না। বলুন দেখি, আমাদের নেকড়ে কি একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ বদমাশ?'

'নেকড়ে তার ত্রুটি শুধরে নিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

'আর সে যদি খরগোশের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে তাহ 'অর্থ' 'দাঁড়া দেখাচ্ছি'রও শেষ।'

'জানেন ত, ফিল্মের প্রতিটি নতুন সিরিজ আমরা এমনভাবে তৈরি করি যেন ওখানেই শেষ। সপ্তম সিরিজে আমরা আমাদের নায়ক দুটির মিলমিশ ঘটিয়ে দিই আর কি! এই সময় গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারকালে আমি তাদের বললাম যে নেকড়ে ও খরগোশের উপাখ্যানের মধুর সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। এরপর কী ঘটল জানেন? মনে হল হল-এর ছাদ বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'না, না!' শেষে দাঁড়িয়ে পড়ে পথরোধ করল, জানাল যে যতক্ষণ না আমি ফিল্ম চলতে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ততক্ষণ আমাকে হল থেকে বেরোতে দেবে না। প্রতিশ্রুতি দিতে হল।...'

আপাতত 'দাঁড়া দেখাচ্ছি'র স্রষ্টারা আমাদের পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে নবম সিরিজ থেকে আরও একটি উপাখ্যান পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন, এখানে ঘটনাস্থল টেলিভিশন স্টুডিও।

৭) খরগোশ বন্দুকধারীর বেশ ছেড়ে পিটটান। দৌড়ে এসে হাজির আর এক স্টুডিওতে।

৮) ...আর সেখানে, সার্কাসের কসরৎকারী ভালুকেরা পিরামিড করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খরগোশ একলাফে সবার ওপরে — নেকড়ে আর তার নাগাল পায় কোথায়!

৯) এমন সময় নীচের ভালুকটা 'গাঁক' করে উঠল।

১০) ভালুকেরা টপাটপ্ নেমে পড়ল, আর খরগোশ গিয়ে পড়ল একেবারে নেকড়ের ঘাড়ের ওপর।

১১) ভালুকেরা ভাবল, বুঝি নতুন পিরামিড তৈরি হচ্ছে। তারা লাফ দিয়ে নেকড়ের ওপর উঠল।

১২) নেকড়ের লিকলিকে ঠ্যাঙ্ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, বেঁকে গেল। বুদ্ধি করে সে 'গাঁক' মন্ত্রটি আওড়াল।

১৩) পিরামিড ভেঙ্গে পড়ল। ভালুকেরা বাঁদিকে লাফ দিল, খরগোশ ডান দিকে চম্পট।

১৪) এদিকে ভয়ঙ্কর চাপের ফলে নেকড়ের আর জায়গা থেকে নড়চড় করার উপায় রইল না। কোনক্রমে চিঁ-চিঁ করে বলল, 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি!'

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

মনে আছে তো, টেলিভিশন কেন্দ্রের একটা স্টুডিওতে নেকড়ে বসে আছে ভাঙা গিটারের ওপর? কী এখন সে করবে? কী আর, ফের ছুটবে খরগোশের খোঁজে। তাকে যে শেষ পর্যন্ত ধরতেই হবে। চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দস্কি আর আ. খাইৎ, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন, শিল্পী স. রুসাকভ তাকে অধরা লম্বকর্ণের পেছনে খামোকা কি ছুটিয়েছেন পুরো এগারো সিরিজ ধরে!

১) নেকড়ের কপাল ভালো বলতে হবে। দরজা খুলতেই দেখে — খরগোশ।

৩) নেকড়ের আর আনন্দ ধরে না: বাক্স থেকে পালাবার আর পথ নেই খরগোশের। ডালা খুলল, কী এক ভুতুড়ে কাণ্ড? শূন্যি বাক্স। দেয়াল ফুঁড়ে চলে গেল নাকি?

২) পাশের স্টুডিওতে ছিল কী একটা রঙচঙে বাক্স। খরগোশ লাফিয়ে পড়ল তাতে। বন্ধ হয়ে গেল ডালা।

৪) তবে বাক্সটা তো আর সাধারণ নয়, ভেল্কিবাজ বেড়ালের জিনিস। তখন সে তৈরি হচ্ছিল ম্যাজিক দেখাবার জন্যে। বাক্সের ডালা খুলল বেড়াল, খরগোশ ফের সেখানে। নেকড়ে একেবারে তাজ্জব।

৫) ঝাঁপিয়ে পড়ল সে বাক্সের ওপর, রাগে আর জ্ঞানগম্যি নেই, থাবা মারল বেড়ালকে...

৬) নেকড়ের ব্যাভারটা ভেল্কিবাজের ভালো লাগল না বৈকি। বেড়াল হাতের কয়েকটা যাদুভঙ্গি করতেই নেকড়েটি একেবারে শূন্যে।

৭) খরগোশ ওদিকে কোথাও পালায় নি। টেবিলের কাছে বসে সে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছিল যাদুকরের কাণ্ড। হাত তালি পর্যন্ত দিলে।

৮) আর বেড়াল সাঁত্যকারের মণ্ডশিল্পীর মতো করতালির প্রত্যুত্তর দিলে মাথা নুইয়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে রইল না নেকড়ের কথা। সেও ধপাস করে পড়ল মেঝেতে।

৯) তবে খরগোশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া তার এবারেও হল না। টনক নড়তেই বেড়াল ফের তার তুকতাক করলে। নেকড়ে ফের শূন্যে, যেন শুয়ে আছে সোফায়, কেবল কড়মড় করছে দাঁত।

১০) এই সময় স্টুডিওতে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল বোলতা। বেড়াল বিরক্ত হয়ে উঠল, তাড়াতে গেল বোলতাটাকে, ভুলে গেল নেকড়ের ব্যাপারটা...

১১) নেকড়ে ফের ধপ করে পড়বেই তো। যন্ত্রণায় ডুকরে উঠল নেকড়ে, ঘুষি পাকাতে লাগল।

১২) বেড়ালকে বললে, 'দাঁড়া, দাঁড়া, আমি এবার তোকেই শূন্যিতে পাঠাব।'

১৩) সাঁত্যকারের যাদুকরের মতো সে থাবা বাড়িয়ে দিলে। শুধু তুকতাক করা আর হল না।

১৪) যাদুদণ্ড দোলালে বেড়াল, অমনি নেকড়ের থাবায় এসে গেল ফুল ভরা এক ফুলদানি।

১৫) ক্ষেপে উঠল নেকড়ে। গজরাল, 'বটে! আমায় নিয়ে তামাসা? আমি... আমি তোমাদের...' এই বলে ফুলের তোড়া মেঝেতে ফেললে। তারপর কী হয়েছিল নেকড়ের মনে নেই। চোখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল তার...

১৬) যখন জ্ঞান ফিরল, দেখে বসে আছে নিজের বাড়িতে (১১ নম্বর সিরিজের গোড়াটা মনে আছে তো?)। খরগোশ, বেড়াল, টেলিভিশন কেন্দ্র, কোথাও কিছু নেই। সবটা হয়ত স্বপ্ন? অবাক লাগল নেকড়ের তাহলেও কী জানি কেন, বললে, 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

মনে আছে তো, আমাদের খরগোশ আর নেকড়েকে আমরা রেখে এসেছিলাম নববর্ষের কার্নিভালে। চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দ্‌স্কি ও আ. হাইৎ, পরিচালক কতিওনচ্‌কিন এবং চিত্রকর স. রুসাকভের সাহায্যে খরগোশ কতবার রেহাই পেয়েছে আর কতবারই না নেকড়ে শাসিয়েছে 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' বলে! এবারও নেকড়ে আশা ছাড়ে নি। কিন্তু যা ঘটল তা এই:

(১) নহবৎ বাজছে, নববর্ষের সাজানো ফার গাছ ঘিরে নাচছে জন্তু-জানোয়ারেরা। নেকড়ে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

২) খরগোশ তার কথা যেন একেবারে ভুলেই গেছে। শীত-দাদুর সাজ করে সে গেল মাই-ক্রোফোনের কাছে — আর নববর্ষের যা রেওয়াজ — ডাকলে তুষারিকাকে।

৩) যবনিকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তুষারিকা, সবাই একেবারে স্তম্ভিত। এ যে নেকড়ে! খাটো ফার কোট পরেছে, বেণী বেঁধেছে, সবাই হেসে মরে আর-কি।

৪) শুধু খরগোশের আর হাসি পায় না। কিন্তু কী আর করা, নতুন বছর বলে নতুন উপহার নিয়ে শীত-দাদুর গান শুরু করল সে।

৫) নেকড়েও তার ভূমিকা পালন করে চলল। সেও গান ধরলে, শুধু ধুয়োটা কেমন যেন আজব ধরনের: 'দাঁড়া শীত-দাদু, দেখাচ্ছি!'

৬) গাইছে নেকড়ে, নাচছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, ওদিকে মাই-ক্রোফোনের তারে জড়িয়ে যাচ্ছে পা। আর খরগোশ ইতিমধ্যে কোট ফেলে দৌড়!

৭) নেকড়েও তার পেছন নিতে চাইল, কিন্তু তার তাকে ছাড়ে না। রেগে-মেগে নেকড়ে কুটি-কুটি করলে তার...

৮) ...ওভারকোট খুলে বেণী ছুড়ে ফেললে, দ্যাখে খরগোশ তখন বহুদূরে।

৯) খরগোশ ছুটে গেল ভালুকের কাছে। স্কুটার খেলার ম্যানেজার ভালুক। তাতে চেপে খরগোশ চলে গেল অনেক দূরে।

১০) এ খেলায় যেতে হয় পথে বসানো স্কিট্‌লের মধ্যে দিয়ে এ'কেবে'কে। খরগোশ সেটা পারল, একটা স্কিট্‌লও উলটে পড়ল না।

১১) নেকড়ে কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দূরের খরগোশ ছাড়া আর কিছুই দেখছিল না... দড়াম্‌! দিকবিদিকে ছিটকে গেল স্কিট্‌ল আর নেকড়ে চিৎপাত।

১২) উঠে চেয়ে দ্যাখে, আরেকটা খেলা — রণপায়ে ছোটা। লম্বা রণপায়ে খরগোশ ওদিকে আরো এগিয়ে যাচ্ছে।

১৩) নিজের জন্যে রণপা বেছে নিয়ে নেকড়েও ছুটল খরগোশের পেছন পেছন। ভাবছে, এবার আর ছাড়ান পাবি না।

১৪) আসলে এগুলো মোটেই রনপা নয়, এগুলো প্রকাণ্ড উটপাখির পা। আর বুঝতেই পারছ নেকড়ে তার পায়ে উঠেছে এটা উটপাখির পছন্দ হল না।

১৫) নেকড়েকে ঝেড়ে ফেলল উটপাখি পা থেকে আর ভালো করে শক্ত শক্ত নখ বাগিয়ে কষে একটা লাথি কাড়লে।

১৬) নেকড়ে যতক্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়ল, খরগোশ ততক্ষণে উধাও। মাটিতে বসে ভেউভেউ করে কাঁদে নেকড়ে, তবুও মুঠো পাকিয়ে শাসাতে ছাড়ে না: 'দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি!'

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

বহু সিরিজের কার্টুন ফিল্ম 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'র ছোটো-বড়ো ভক্তদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণ করে পত্রিকার পাতায় ফের দেখা দিয়েছে নেকড়ে আর খরগোস। এবার তাদের অ্যাডভেঞ্চার সমুদ্রবক্ষে, স্টিমারে।

আগের মতো নতুন এই সিরিজটিও চিত্রনাট্যকার ফ. কামোভ, আ. কুর্লিয়ান্দস্কি, আ. খাইৎ, পরিচালক কোতিয়নোচ্‌কিন, চিত্রকর স. রুসাকভের সৃষ্টি।

আর এই সুযোগে অসংখ্য চিঠির একটা জবাবও দিয়ে দিই। সব চিঠিতেই একটাই অনুরোধ: কার্টুন ফিল্মটির বিভিন্ন সিরিজ ছাপা হয়েছে পত্রিকার যেসব সংখ্যায় তার কোনোটা বা সবকটাই পাঠান। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকা পাঠায় না। তাই আমাদেরও সনির্বন্ধ অনুরোধ: এই ধরনের চিঠির যদি জবাব না পান, রাগ করবেন না।

...এবার শুরু করা যাক। দক্ষিণের একটা বড়ো শহরে তপ্ত গ্রীষ্ম দিনের ঘটনা।

১) সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছে নেকড়ে: বেল-বটম্‌স্ ট্রাউজার, শাদা টুপি, দাঁতের ফাঁকে পাইপ — মানে, খাঁটি একটি নাবিক। সামুদ্রিক নেকড়ে।

২) বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখে জেটিতে একটা মস্ত শাদা স্টিমার ভিড়েছে। নামিয়ে দেওয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছে — কে বলো তো? খরগোস!

৩) নেকড়ে গিয়ে হাত ধরল খরগোসের, যেন বাপ আর ছেলে। খরগোসের কাছ থেকে টিকিট কেড়ে নিয়ে এগিয়ে দিল রাশভারী ক্যাপ্টেনের দিকে।

৪) টিকিটের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, তাতে লেখা: 'হাফ টিকিট'। বুঝল ক্যাপ্টেন কী ব্যাপার। হুড়মুড়িয়ে নেকড়েকে ধাক্কা, পাইপটা পর্যন্ত খসে পড়ল।

৫) কী করে ওঠা যায় স্টিমারে? দেখে স্টিমারের দিকে যাচ্ছে এক মোটা হস্তিনী, সঙ্গে চেন-বাঁধা এক কুকুর। নেকড়েটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল...

৬) ...কুকুরের বগলসটি খুলে নিজে পরল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলল হস্তিনীর পেছু পেছু, যেন সে তারই কুকুর।

৭) এবার তার চালটা খাটল। হাতিনী কিছুই খেয়াল করে নি, তার ওপর তার বিরাট বপু দিয়ে নেকড়েকে আড়াল করে রাখল ক্যাপটেনের চোখ থেকে। ডেকে ছুটে গেল নেকড়ে...

৮) ...চেয়ে দেখে কোথায় লুকোবে? নজরে পড়ল, ডেকে ইস্পাতের বর্গা। সুড়ুৎ করে সে বর্গাগুলোর ভেতরে গিয়ে ও'ৎ পেতে রইল খরগোসের জন্যে।

৯) বসে আছে, এমন সময় মাথার ওপর দেখা দিল ক্রেনের হাত, তাতে বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবস্থা। ইস্পাতের বর্গাগুলোকে টেনে তুলল চুম্বক, সেইসঙ্গে লোহার বগলস সমেত নেকড়েকেও।

১০) বগলসে ঝুলতে ঝুলতে নেকড়ে চলল ডেক, সমুদ্র, জেটি পেরিয়ে... প্রাণপণে ছাড়াতে চায়, পারে না।

১১) ফের নেকড়ে গিয়ে পে'ছিল তীরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় করে। কী তার কপাল, সে কিনা এখানে, আর ওদিকে...

১২) ...ডেকে বেরিয়ে বেড়াচ্ছে খরগোস। দিব্যি নিশ্চিন্তে বেড়াচ্ছে, যেন কাছে পিঠে কোনো নেকড়েই নেই।

১৩) আর পারল না নেকড়ে। টাল সামলাবার জন্যে হাতের কাছে যা পেল, একটা লাঠি নিয়ে হাঁটতে লাগল দড়ি বেয়ে, যা দিয়ে স্টিমার ছিল তীরের সঙ্গে বাঁধা।

১৪) খরগোসের ততক্ষণে বেড়ানো শেষ হয়েছে, বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে সে। আর এক পা ফেললেই নেকড়ে পে'ছে যাবে তার কাছে। কিন্তু হঠাৎ বাতাস বইল...

১৫) ...বাতাসে খবরের কাগজ উড়ে গিয়ে পড়ল ঠিক নেকড়ের মুখের ওপর। চোখ ঢেকে গেল নেকড়ের, টাল সামলাতে না পেরে লাঠি খসে পড়ল হাত থেকে, নিজেও সমুদ্রে ঝপাং!

১৬) ঠিক এই সময় নোঙর তুলছিল স্টিমার। নেকড়ে উঠল নোঙরের ওপর, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল শেকল। কাঁপছে, কোথায় সে সামুদ্রিক নেকড়ে, একেবারে ভেজা মুরগী!

১৭) তাকে দেখতে পেল ক্যাপটেন। জিজ্ঞেস করলে, 'খরগোস বুঝি?' (বিনা টিকিটের যাত্রীদের বলা হয় 'খরগোস'।) খুশি হয়ে উঠল নেকড়ে, ক্যাপটেন তাকে চিনতে পারে নি। বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খরগোস!'

১৮) আর বিনা টিকিটের 'খরগোসদের' ক্যাপটেন রেফ সইতে পারত না। বললে, 'তাহলে দাঁড়া খরগোস, দেখাচ্ছি!'

তৃতীয় বার তীরে এসে পড়ল নেকড়ে।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!
তোমাদের মনে আছে তো, মৌলতিফিল্ম স্টুডিওতে
খরগোসকে ধরার প্রথম চেষ্টায় বিফল হয় নেকড়ে।
বড়ো মণ্ডপ আর দরজার ছড়াছড়ি সেখানে,
আর তার পেছনে কী যে আছে কে জানে। কার্টুন ফিল্মের
চিত্র-নাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দ্‌স্কি আর আ. খাইত, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন
এবং শিল্পী-প্রযোজক স. রুসাকোভ বাস্তবে ওইভাবেই সাজিয়েছিলেন।
এবার স্টুডিওর লম্বা করিডোরের প্রতিটি মোড়েই
আমাদের নায়কদের নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চার।
(১) সামনের খোলা দরজার দিকে ছুটল খরগোস, স্বভাবতই নেকড়েও তার পেছু পেছু।
(২) এখানে তখন মহলা চলছিল। তবে ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজনদার ছিল না সেখানে। খরগোসও অমনি লাফ দিয়ে বসে পেটাতে লাগল ড্রাম।
(৩) নেকড়েও হাবা নয়। খরগোসের এই চালাকিটা ধরে ফেলে সে ভাবলে, এবার খরগোস, আমার কাছ থেকে আর পালাতে হচ্ছে না।
(৪) খরগোসও কোনো কেয়ার না করে ড্রামে আর ঝাঁকে বাড়ি মেরে চলল, যেন সারা জীবনই সে বাজনদার।
(৫) খরগোসকে ধরতে চায় নেকড়ে কিন্তু তাদের মাঝখানে এক কে'দো কুকুর গান গাইছে।
(৬) নেকড়ে ভাবলে, 'ওদের প্যাণ্ট ডোরাকাটা, আমারও। ভান করা যাক যে আমি ওদেরই একজন'।

(৭) করলেও তাই। কার একটা গিটার টেনে নিলে... কুকুরদের চোখ লোমে ঢাকা, তাছাড়া নিজেদের গানে তারা এত বিভোর যে কিছুই খেয়াল করলে না। তারে টংকার দিল নেকড়ে।

(৮)... কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই। গিটার সে মোচড়ালে, ঝাঁকালে, ফল হল না কোনো। এদিক ওদিক চাইল নেকড়ে...

(৯) দেখে সব বাজনদারের গিটার বৈদ্যুতিক কোটরে লাগানো।

(১০) ভাবলে, বটে, এই ব্যাপার? তাতে আর কী হয়েছে। এই তো প্লাগ...

(১১) আর ওই তো সকেট। গিটারকে সে লাগাল চড়া টেনশনের সকেটে।

(১২) অমনি স্ফুলিঙ্গ, আওয়াজ, নেকড়ে ভেবেই পায় না কী ব্যাপার?

(১৩) নেকড়ে আর তার গিটার ধাক্কা খেল প্রচণ্ড। মঞ্চে ছোটাছুটি করে নেকড়ে, গিটা-রের তারে লাফায় তার থাবা...

(১৪)... ওদিকে ঝমঝম করে বাজনা, গাঁ-গাঁ করে কুকুরেরা, খরগোস পিটিয়ে যায় ড্রাম, যেন এমনটিই হওয়ার কথা।

(১৫) শুধু নেকড়ের শক্তি আর নেই। চুলোয় যাক খরগোস, নিজেই সে জড়িয়ে পড়েছে বিদ্যুতের ফাঁদে।

(১৬) প্লাগ কী করে সে খসিয়েছিল নেকড়ের তা মনে নেই। প্রচণ্ড আওয়াজ হল স্টুডিওতে, অন্ধকার হয়ে এল নেকড়ের চোখ...

(১৭) জ্ঞান ফিরতে দেখে, স্টুডিওতে কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে, নিজে সে বসে আছে ভাঙা গিটারের ওপর।

(১৮) কী চণ্ডাল রাগ তার হল বলার নয়। বিদ্যুৎ-খাওয়া ঘুসি পাকিয়ে সে বীভৎস গলায় চাচাল, দাঁড়া খরগোস দেখাচ্ছি!

খোলা সমুদ্রে নেকড়ে আর খরগোশের কাণ্ড-কারখানা শেষ হতে চলেছে, সামান্য একটুখানি শুধু বাকি। তবে একান্ত গোপনে বলি, বহু সিরিজের এই জনপ্রিয় কার্টুন ফিল্মটির রচয়িতারা (চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দস্কি আর আ. খাইৎ, পরিচালক ভ. কোতিয়নোচ্কিন, চিত্রকর স. রুসাকভ) প্রথমে ঠিক করেন যে, নায়ক দুটির মিলমিশ ঘটিয়ে দেবেন। সে খবর পেয়ে ছোটো-বড়ো সমস্ত দর্শকই অস্থির হয়ে ওঠেন: নেকড়ে আর খরগোশের মিলন মানে তো নতুন সিরিজ আর বেরুবে না? ফলে অজস্র প্রতিবাদ পত্র আসতে থাকে 'সয়ুজমুল্ৎফিল্ম' স্টুডিওতে। কী আর করা যায়, রচয়িতারা নিঃশ্বাস ফেলে নতুন সিরিজের জন্যে কাজ শুরু করেছেন, শিগ্গিরই পাঠকেরা তার পরিচয় পাবেন বলে আশা করি।

আর আপাতত, নেকড়ে আর খরগোশের সমুদ্রযাত্রার উপসংহার।

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

(১) বুঝতেই পারছ, খরগোশ সন্দেহও করে নি কী বিপদ তার ঘাড়ে। ডেকের ওপর পায়চারি করছে সে, চারিদিক চুপচাপ, শান্ত...

(২) নেকড়েও অমনি হাজির। ছুটে গিয়ে কপিকল ঘোরাতে লাগল, যাতে ডেকের হ্যাচ-ওয়ে খুলে যায়। হ্যাচ-ওয়ে দিয়ে খরগোশ পড়বে খোলের ভেতর, সেখানে নেকড়ে তাকে ধরবে।

(৩) হয়ত সিন্দবাদের দেখছিল খরগোশ, নয়ত কিছু একটু ভাবছিল, শুধু হ্যাচ-ওয়েটি লক্ষ্য করে নি। বাস্ — দুম্! একেবারে জাহাজের খোলে। আর নেকড়ের তো সেইটেই চাই।

(৪) নেকড়ে লাফিয়ে গেল খরগোশের দিকে, কিন্তু কপাল খারাপ, খোলে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। কোথায় লুকিয়েছে খরগোশ? টর্চ বার করে নেকড়ে তা জ্বালাল।

(৫) হঠাৎ দেখে: টর্চের আলোয় ভয়ঙ্কর এক মূর্তি। আসলে খরগোশ তার থাবা দিয়ে ছায়া ফেলছে দেয়ালে। ছায়া কাঁপছে, ভয়ঙ্কর মূর্তিটা চোখ মটকাচ্ছে নেকড়ের দিকে।

(৬) নেকড়ের একেবারে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কে জানে এটা কোন জানোয়ার। হয়ত খরগোশ-কে খেয়ে এখন তাকে ধরবার তালে আছে। প্রাণপণে নেকড়ে তার টর্চ ছুঁড়ে মারল বিকট প্রাণীটার দিকে।

(৭) মারল এমন খাশা যে ফুটো হয়ে গেল জাহাজের খোল। হুড়-হুড় করে জল ঢুকতে লাগল ভেতরে। তখন কোথায় আর ধর-পাক-ড়ের সময়, জান বাঁচাতে হবে, জাহাজটাকেও।

(৮) এক দণ্ড হাত না গুটিয়ে খাটছে নেকড়ে আর খরগোশ। বস্তা চাপাচ্ছে ফুটোয়, যা পাচ্ছে গুঁজছে। খাটছে মিলেমিশে, সময় নষ্ট করছে না একটুও।

(৯) এবার খোলের জলটা ছেঁচে ফেলতে হবে। খরগোশ আর নেকড়ে চালা-তে লাগল পাম্প। নিজেরা ভিজে গেল বটে, তবে খোল হয়ে উঠল আগের মতোই শুকনো খট্‌খটে।

(১০) বসল একটু জিরিয়ে নিতে, পাশাপাশি, বন্ধুর মতো। খরগোশ পাইপ খেতে চাইল না। নেকড়েকে সে গাজর দিতে গেল, মাথা নাড়লে নেকড়ে — ওটা তার খাদ্য নয়।

(১১) তারপরে তো নেকড়ে আর খরগোশ একসঙ্গে গেল বেড়াতে। নেকড়ে ভাবে: 'মন্দ নয় ছোঁড়াটা, তাহলে সাত সিরিজ ধরে ওকে তাড়া করে ফিরছি কেন?'

(১২) খরগোশও নিশ্চয় ভালো কিছুই ভাবছিল, আর ভাবতে ভাবতে খেয়ালই করে নি কখন মাড়িয়ে দিয়েছে নেকড়ের প্যান্ট।

(১৩) ফট্ করে ছিঁড়ে গেল। নিজের বাহারে প্যান্টখানার দিকে চেয়ে নিথর হয়ে গেল নেকড়ে। খরগোশ কৈফিয়ৎ দেয় — হঠাৎ হয়ে গেছে মাইরি, ইচ্ছে করে নয়, আর কখনো করব না...

(১৪) কিন্তু তখন আর কোথায় বাঁচোয়া! রাগে ক্ষেপে গিয়ে নেকড়ে তার ফতুয়া ছিঁড়ে ফেললে। আর বুকে তার উল্কি কাটা: 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

'সোভিয়েত ইউনিয়ন' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা জনপ্রিয় কার্টুন চলচ্চিত্র-সিরিজ 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি'র চরিত্রগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচিত। এই চলচ্চিত্রটির কাহিনীকার হলেন আ. কুর্লিয়ান্দ্স্কি ও আ. খাইত্। চিত্রটির পরিচালক হলেন ভ. কতেনোচ্কিন, শিল্প-নির্দেশক স. রুসাকভ এবং এতে কাজ করেছেন 'সোয়ুজমুল্ত্ফিল্ম স্টুডিও'র বড় একদল শিল্পী।

'এর আগের আটটি অধ্যায়ে নেকড়ে কখনোই খরগোশকে ধরতে পারে নি। তা, এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই,' খবরটি আমাদের জানালেন ভিয়াচেস্লাভ কতেনোচ্কিন। বললেন, 'তার কারণ নেকড়ে একা মানুষ, আর ও যাতে খরগোশের নাগাল না পায় তার জন্যে কাজ করে যাচ্ছি আমরা বেশ বড় একদল শিল্পী'।

আমাদের বাচ্চা পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে নিচে 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি' চিত্রকাহিনী থেকে আরও একটি চিত্রকথা ছাপা হল।

(১) খরগোশের পেছনে তাড়া করে করে নেকড়ে এখন ক্লান্ত। সে ঠিক করল বাড়িতে বসে এবার সে টেলিভিশনে ফুটবল খেলা দেখবে।

(২) খাওয়ার জন্যে একটা শুটকি মাছ টেনে বের করল নেকড়ে। ভাবল, যতই যাই হোক জীবনটা একবারে মাঠে মারা যায় নি!

(৩) নেকড়ে মাছটা ভাঙবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। মাছটা বড্ড বেশি শুকনো হয়ে গেছে, এই আর কি।

(৪) শরীরের সবটুকু শক্তি একত্র করে এবার সে মাছটাকে মাটিতে আছাড় মারতে গিয়ে টাল সামলাতে না পারায় একেবারে চিৎপটাং নেকড়ে।

(৫) এবার মাছটাকে সজোরে সে টেবিলের ওপর ছুড়ে মারল। তাতে টেবিল ভেঙে হয়ে গেল টুকরো-টুকরো, কিন্তু মাছটা যেমন তেমনই রইল।

(৬) ফের সে মাছটাকে জানলার তাকে আছড়াল। জানলার তাক গেল ধসে, কিন্তু মাছটা রয়ে গেল যে-কে সেই।

(৭) মাছটাকে আছড়ে আছড়ে এইভাবে নেকড়ে তার চারপাশের সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করতে শুরু করল। ওই-ওই, ভাঙল একটা ফুলদানি...

(৮) চায়ের কেটলিটাও চ্যাপ্টা হয়ে গেল, অথচ মাছটা তখনও রয়ে গেছে আস্ত, অখণ্ড।

(৯) এইভাবে নেকড়ে সব ক'টা আসবাব ভাঙল। এখন একমাত্র আস্ত আছে টেলিভিশন-যন্ত্রটা। আস্তে তার গায়ে গা ঘষল নেকড়ে।

(১০) আরে, অবাক কাণ্ড! টেলিভিশন-পর্দায় ফুটে উঠল একটা মূর্তি। আর দেখা গেল ফুটবল খেলার বদলে পর্দায় খরগোশের ছবি। গান গাইছে খরগোশ।

(১১) নেকড়ের আর সহ্য হল না। সজোরে সে টেলি-ভিশনের গায়ে ঘা দিল। টেলিভিশন গেল গুঁড়ো হয়ে, কিন্তু মাছটা তখনও রয়ে গেল আটুট।

(১২) কিন্তু, হায় রে হায়, দেখা গেল টেলিভিশনের একটা টিউব তখনও কাজ করে চলেছে, আর খরগোশও গান গেয়ে চলেছে গলা ছেড়ে, মনপ্রাণ ঢেলে।

(১৩) কিন্তু খরগোশ-ব্যাটাকে হাতে পাওয়া যায় কোথায়? — নেকড়ে ভাবল। নিশ্চয়ই টেলিভিশন স্টুডিওতে, আবার কোথায়!

(১৪) নেকড়ে গিয়ে একটা স্টুডিওয় ঢুকল, তারপর আরেকটায়। খরগোশ-ব্যাটা গেল কোথায়?
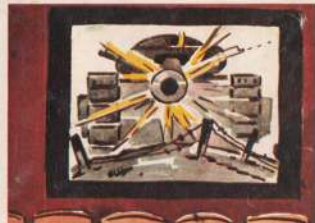
(১৫) অবশেষে গিয়ে সে তৃতীয় স্টুডিওটায় সেঁধোল। আর সেখানে দ্যাখে কী, একটা ট্যাঙ্ক তার দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ ট্যাঙ্কটা দাঁড়িয়ে পড়ে নিশানা ঠিক করে ওর দিকে গোলা ছুড়ল।

(১৬) আর ভয়ে, আতঙ্কে দিশাহারা নেকড়ে উঠল চিৎকার করে, 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি মজা!'

দাঁড়া দেখাচ্ছি!

গত বছর থেকে আমরা কার্টুন ফিল্মের জনপ্রিয় একটি সিরিজের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটাতে শুরু করি। এবার ফিল্মের স্রষ্টারা (চিত্রনাট্যকার ফ. কামোভ, আ. কুর্লিয়ান্দস্কি, আ. খাইৎ, পরিচালক ভ. কোতিয়নোচ্‌কিন, শিল্পী স. রুসাকভ) ঘটনাকে নিয়ে গেছেন তপ্ত দক্ষিণে, নীল সাগরে, মস্তো এক শাদা জাহাজে।

তাই চলল খরগোস আর নেকড়ের অ্যাডভেঞ্চার...

১) তীরে দাঁড়িয়ে আছে নেকড়ে, রাগে দাঁত কড়মড় করছে, ঘুঁষি দেখাচ্ছে, কিন্তু করবার কিছু নেই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল আগেই, খরগোসকে নিয়ে তা চলল কোথায় কে জানে।

২) তবে হার মানবার পাত্র নয় নেকড়ে। তীরের কাছে কার একটা নৌকো দুলছিল, তাতে লাফিয়ে উঠে নেকড়ে ছুটল জাহাজের পাল্লা ধরতে।

৩) বাঃ কী বিপদ! বাতাস বইতে শুরু করল উল্টো দিক থেকে। আর বুঝতেই পারছ, জাহাজ তো, কেবলি এগিয়ে যায়, নেকড়ে তার নৌকাটিতে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

৪) ঝানু নাবিকের মতো নেকড়ে আঙুলে থুতু ফেলে সেটা উঁচু করে ধরল। বোঝা গেল বাতাস সত্যিই অনুকূলে নয় বরং প্রতিকূল। কী করা যায়?

৫) পেয়েছি! বুক ভরে বাতাস টেনে সে ফুঁ দিতে লাগল পালে। আর আক্রোশে এমন জোর ফুঁ দিতে লাগল যে নৌকো ফের চলল তরতরিয়ে।

৬) ধরে ফেলল জাহাজের নাগাল। নৌকোর মাস্তুল থেকে হুমড়ি খেয়ে ঝুলতে লাগল সাঁকোর মতো। তারপর হ্যাঁচকা টান মারতেই একেবারে জাহাজের ডেকে।
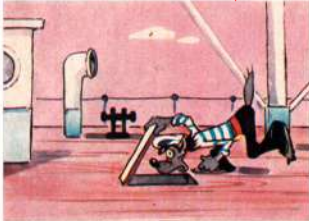
৭) এবার প্রথম কাজ হল খরগোসকে খুঁজে বার করা। ডেকে ওকে দেখা যাচ্ছে না। সব ফাটল-ফোকরে উঁকি দিতে লাগল নেকড়ে, এমনকি জাহাজের খোলেও নাক গলালে: লুকিয়ে নেইত?

৮) হঠাৎ আঁতকে কেঁপে উঠল: দেখে সেই কড়া ক্যাপটেন হেঁটে আসছে ডেক দিয়ে। সেই যে তাকে জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। কোথায় যায়? নাবিকের ভান করবে?

৯) থাবায় ন্যাকড়ার থোপনা নিয়ে ডেক সাফ করতে লেগে গেল সে, যেন সকাল থেকে শুধু তাই করছে। ক্যাপটেন ছিল শৃংখলার ভক্ত। নেকড়ের তারিফ করে এগিয়ে গেল ক্যাপটেন।

১০) আর ক্যাপটেন পিঠ ফেরাতেই একদিকে ন্যাকড়া আরেক দিকে বালতি ঠেলে নেকড়ে একেবারে ভোঁ দৌড়।

১১) একটার পর একটা কেবিনে উঁকি দেয় নেকড়ে, খরগোসের আর দেখা নেই। গেল কোথায়, নেকড়েরা খেয়ে ফেললে নাকি?

১২) আরে চাঁদু এইখানে! বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখছে। নেকড়ে তোমায় সুখস্বপ্ন দেখাচ্ছে এইবার... ইস্টনাম জপো খরগোস...

১৩) ...কিন্তু এই সময় কালো মেঘে ঝলক দিল বিদ্যুৎ, বাজ ডেকে উঠল, হঠাৎ আছড়ে পড়ল তুফান। ঢেউয়ে দুলতে থাকল জাহাজ...

১৪) ...দুলতে লাগল ডেক। তখনো ঘুম ভাঙে নি খরগোসের, কিন্তু তার যে সুটকেসটি কেবিনের তাকে, সেটি পিছলাতে পিছলাতে — দড়াম! একেবারে নেকড়ের মাথায়!

১৫) ককিয়ে উঠল নেকড়ে, লাফিয়ে উঠল। কিন্তু পায়ের তলে ওদিকে পাটাতন উথাল-পাথাল, উলটে পড়ল নেকড়ে, ফের পেছন থেকে সুটকেসের গুঁতো!

১৬) একেবারে ক্ষেপে গেল নেকড়ে। 'দাঁড়া, দেখছি, চামড়ায় তুই তৈরি না হলেও তোকে খাব।' আর ঝাঁকুনিতে ওদিকে কটপট করছে স্যুটকেস, ডালা তার ওঠে আর পড়ে যেন সেই নেকড়েকে খাবে।

১৭) বেদম ভয় পেয়ে গেল নেকড়ে, ছুটল দরোজার দিকে, থাকগে তোমার খরগোস, চাচা আপন বাঁচা। স্যুটকেস ওদিকে পেছন থেকে তার প্যান্টে — ঠাস!

১৮) ডেকে ছুটে পালাল নেকড়ে, ভয়ের চোটে উঠে পড়ল ফ্ল্যাগস্টাফে, সেখানে বসে বসে বৃষ্টিতে ভেজে, দোলে আর ঘুষি পাকায়: 'দাঁড়া খরগোস, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি।'

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দ্স্কি আর আ. হাইত, পরিচালক ভ. কতেনোচ্কিন এবং শিল্পী স. রুসাকোভ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন কোথায় পাঠানো যায় তাঁদের বন্ধু সিরিজের কার্টুন ফিল্মের নায়কদের। সবখানেই তো তারা গেছে, শহরে গ্রামে, শূন্যে, টেলিভিশন স্টুডিওতে, নববর্ষের মুখোশ নৃত্যে, রাস্তা-ঘাটে, স্টেডিয়ামে...

অনেক ভেবেও কূল মিলত না যদি-না পুরনো বন্ধু জোলাকিয়াজ বেড়াল বলত পাঠাও সার্কাসে, এমনকি টিকিট জোগাড় করে দেবার কথাও সে দিলে।

এবং কথাও সে রেখেছিল। ফলে খরগোশ আর নেকড়ে গিয়ে পড়ল সার্কাসে এবং বুঝতেই পারছ, বসার জায়গাটা পাশাপাশি...

নেকড়ে সেটা দেখতে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল খরগোশের ওপর আর খরগোশ পালিয়ে গিয়ে সোজা মল্লভূমিতে।

চাঁদোয়া থেকে নামছিল দড়ির মই। খরগোশ লাফিয়ে উঠল তাতে এবং চটপট একেবারে ওপরে।

বেশিক্ষণ ও ভাবলে না নেকড়ে, কোট খুলে ফেলে ধাওয়া করলে খরগোশের পেছনে।

কিন্তু সে ওপরকার চাতালে পেঁছিতে না পেঁছিতেই খরগোশ তত্ক্ষণে ওস্তাদ বাজিকরের মতো হাঁটতে শুরু করেছে দড়ি বেয়ে।

নেকড়ে পেছবার লোক নয়। টাল সামলাবার লাঠিটা নিয়ে সেও চলল পেছন পেছন। দর্শকেরা হাসে, হাততালি দেয়, ভাবে ওটা বুঝি সার্কাসেরই একটা খেলা।

শুধু দড়ির মাঝখানটায় ঝুলছিল একটা রঙিন বেলুন। খরগোশ সহজেই গলে গেল তার নিচ দিয়ে...

নেকড়েকে সেটা সরাতে হল ঠেলা দিয়ে। সামান্য ঠেলা দিয়ে নেকড়ে এগিয়ে গেল।

বেলুন কিন্তু ফিরে এসে পেছন থেকে বেদম ঘা মারলে নেকড়েকে, সে আর সামলাতে পারল না...

লাগি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একেবারে ডিগবাজি। খরগোশ তার জন্যে বলতে-কি ভয় পেয়েই গেল।

তবে মাটিতে নেকড়ে পে'ছিল নিরাপদেই, অ্যাক্রোবাটদের জন্যে তৈরি করা ট্রাম্পোলেনের পাশেই।

খরগোশ সেটা দেখেই বুঝে নিল রেহাই পেতে হবে কী করে। ভাব করলে যেন লাফাতে চাইছে।

নেকড়ে উঠল ট্রাম্পোলেনে আর খরগোশ তার থাবা তুলে হাতছানি দেয়; নে লাফ দে, শিগগির!

খরগোশ তখন দে ঝাঁপ! সার্কাসের লোকেদের লাফাতে দেখেছে তো, হিসাবে ওর ভুল হয় নি।

খরগোশ গিয়ে পড়ল তক্তার উল্টো দিকে, আর ট্রাম্পোলেন নেকড়েকে ছুঁড়ে দিল প্রচণ্ড জোরে।

উড়ে গেল সে একেবারে চাঁদোয়া পর্যন্ত, মাঝপথে টুকরো টুকরো করে দিলে রঙচঙে বেলুনটাকে, ফুটো করে দিলে চাঁদোয়া...

...উঠে গেল চাঁদোয়ার ওপরে। দেখে সন্ধ্যার আকাশে মিটমিট করছে তারা, চোখ মটকাচ্ছে, যেন হাসছে তার দুরবস্থায়। মুঠো পাকিয়ে নেকড়ে শাসালে, 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'

দাঁড়া দেখাচ্ছি!

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, চিত্রনাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্দস্কি আর আ. হাইৎ, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন আর শিল্পী স. রুসাকভ খরগোশ আর নেকড়ের শেষ সাক্ষাৎটা ঘটিয়েছিলেন শীতকালে। সেবারেও কাঁচকলা দেখায় খরগোশ। 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' কার্টুন ফিল্মের অষ্টম সিরিজে আরেক ব্যাপার। নববর্ষ কাছিয়ে এসেছে, মজাদার এক কার্নিভালের ব্যবস্থা করেছে জন্তু-জানোয়াররা কিন্তু নেকড়েকে ডাকে নি, উৎসবটাই মাটি করে দেবে যে।

(১) রাস্তা থেকে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখছে নেকড়ে, হিংসেয়, রাগে মরে। হঠাৎ চোখে পড়ল কেমন যেন চেনা-চেনা ছায়া!... আরে এ যে খরগোশ!

(২) আর পারল না নেকড়ে, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। ভাবছে কী করে চুপিচুপি গিয়ে ধরে, হঠাৎ দ্যাখে...

(৩) ...খরগোশ নিজেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেকড়ে খেয়ালই করল না যে খরগোশ হয়ে উঠেছে মাথায় লম্বা, গতরে ভারী।

(৪) নেকড়ে ঝাপটে ধরল তাকে: এইবার বাছাধন ফাঁদে পড়েছ! এক্ষুনি আমি তোকে... দাঁড়া না কী করি...

(৫) মুখোশ খুলে ভালুক আর হেসে বাঁচে না! 'আরে তুই কিনা আমাকে? ওহ্ হাসালি নেকড়ে! হেসে মরি!'

(৬) নেকড়ের ওপর খরগোশের মুখোশ চাপিয়ে দিল সে। নেকড়ে ভাবে, ব্যাপার কী? তার মানে আমি নিজেই এখন খরগোশ?

(৭) ভাবতে না ভাবতেই দ্যাখে সোজা তার দিকেই — বাপো! আসছে কিনা এক নেকড়ে। ভয় পেয়ে গেল সে।

(৮) তবে অন্য নেকড়েটা যেন ভড়কে গেল। নিশ্চয়ই খুব কাঁপুনি ধরেছিল তার, কেননা খসে পড়ল তার মুখোশ...

(৯) ...আর দেখা গেল মোটেই সে নেকড়ে নয়, আস্তো খরগোশ। নেকড়ে একেবারে হেসে কুটোপাটি।

(১০) খরগোশ অবিশ্যি ভোঁ দৌড়, তার পেছু পেছু নেকড়ে। ছুটল তারা লম্বা একটা করিডোর দিয়ে। হঠাৎ এক কোণের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল খরগোশ...

(১১) নেকড়ে তাকে ধরতে যাবে, কোণের পেছন থেকে গর্জে উঠল এক ভয়ঙ্কর সিংহ। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল নেকড়ে।

(১২) দম নিয়ে সামলে উঠে সাবধানে চারিদিকে চেয়ে দেখল নেকড়ে। হয়ত-বা কোনো সিংহই নেই, ও শুধু তার দৃষ্টিভ্রম?

(১৩) ঠিক তাই, এবারেও খরগোশ তাকে ঠকিয়েছে। তাই নিয়ে আবার আনন্দ করছে ব্যাটা লম্বকর্ণ।

(১৪) বটে? গর্জন করে উঠল নেকড়ে, 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি'— শাসাল ঘুঁষি পাকিয়ে।

সামনে জেনিয়া পেছনে ইগর রওনা দিলে বাড়ি থেকে। ক্লাস বসতে তখনো ৪০ মিনিট।

ছেলেরা চিরকালই ছেলে। আঙিনায় মেয়েদের সঙ্গে কিছু একটা তর্ক না বাধালে চলে?

স্কুলের পথ লম্বা

জেনিয়া কনোনেঙ্কো আর ইগর স্ক্ভর্ৎসভ যেখানে থাকে সেখান থেকে ধীরে-সুস্থে স্কুলে যেতে লাগে মাত্র দশ মিনিট। কিন্তু পথে এতই রকমারি ব্যাপার যে চল্লিশ মিনিটেও ওদের কুলোয় না, প্রায়ই দেরি হয়ে যায়।

একদিন ছেলেদুটি যাচ্ছিল রাস্তার এক পাশ দিয়ে, আর অন্য পাশ দিয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে যান আমাদের সাংবাদিক মাই নাচিনকিন। তিনি দেখলেন কি...

সমুদ্রতীরের প্যারাপেটটির চেয়ে কসরৎ দেখাবার যোগ্য জায়গা আর কোথায়?

যা পারি তোমায় সাহায্য করব কাকু, আর যা জানি না তোমার কাছ থেকে শিখে নেব।

হয়ত নতুন বই এসেছে কিছু।

সোজা রাস্তায় গিয়ে কী লাভ? এটা অনেক মজার।

বন্দর নগরীর ছেলেরা দুনিয়ার সব দেশের পতাকা চেনে। দেখা যাক নতুন কী জাহাজ এল।

দেখাই যাক না ওজন একটু বাড়ল কিনা, লম্বা হলাম কালকের চেয়ে কতটা।

এ বয়সে খাবারের একটা ফাঁকা টিন ফুটবলে রূপান্তরিত হতে কতক্ষণ?

না, এ বার কিন্তু দেরি হয় নি।

কয়েকদিন আগের কথা। আমি, মুক আর মিক মাছ ধরতে গেছি। শান্ত সমুদ্র, মাছ বিশেষ ঠোকরাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা বড়ো মাছ টোপ গিলে আমাদের নৌকো উলটিয়ে দেয় আর কি।

টেনে নিয়ে গেল একেবারে খোলা মহাসাগরে।

মস্তো মস্তো ঢেউ ভেঙে পড়তে লাগল নৌকায়।

হঠাৎ আলগা হয়ে গেল টান।

আর চোখের সামনেই জল থেকে ভেসে উঠল দ্বীপ।

দেখা গেল, ওটা দ্বীপ নয়, তিমি মাছ, আমার টোপ গিলেছিল যেটা।

মাছটা সজাগ হয়ে উঠলে কী যে হত কে জানে।

তবে সেই সময়েই দেখা দিল তিমি-শিকারী জাহাজ।

বাচ্চা ছেলে পেতিয়া রীজিক আর তার দুই সঙ্গী মিক আর মুক হল শিল্পী ইভান সেমিওনভের অনেক দিনকার নায়ক। প্রথম তারা দেখা দেয় চোদ্দ বছর আগে যখন 'মজাদার ছবি' নামে শিশু পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বেরয়; তারপর থেকে তিন বন্ধু কত জায়গায় না গেছে — আফ্রিকার জঙ্গলে, সমুদ্র তলের রাজ্যে, মহাকাশে... সবখানেই এক একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। একটা ঘটনার কথা আজ পেতিয়া নিজেই বলছে...

বহু কষ্টে ছিপটা টেনে রাখলাম।

আমার দুই সঙ্গীও আমায় প্রাণপণে সাহায্য করলে।

আমাদের টেনে নিয়ে চলল এক ভয়ঙ্কর গতিতে।

স্বভাবতই নৌকো ভেড়ালাম সেখানে।
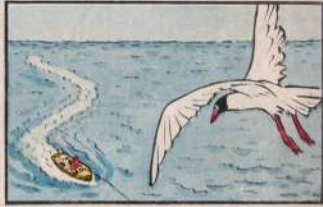
অমন ভয়ঙ্কর ছুটোছুটির পর একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে হল।

তারপর যা ঘটল, সেটা কিছুতেই মাথায় ঢুকল না!

মাছটা দম নিতে পাবার আগেই তাকে জাহাজের গলুইয়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল ঘাঁটিতে।

আমাদের ছবি তুলে 'আশ্চর্য ঘটনা' নাম দিয়ে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলে। বলেছে, দক্ষিণ মেরুতে তিমি ধরা জাহাজে আমাদের নেবে।

গুলবাজ ক্লিমের অ্যাডভেঞ্চার

গুলবাজ ক্লিমকে নিয়ে সাহিত্যিক ভিক্তর গোলিয়াভকিন গল্প লিখেছেন 'এ আবার একটা কাজ নাকি!' শিল্পী ইউরি চেরেপানভ এ নিয়ে ছবি এঁকেছেন ছেলেদের ডায়াফিল্মের জন্য।

...গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিনটিতে সারা ক্লাস জুটল আঙিনায়। আলোচনা হল ছুটিতে কে কী করবে। ক্লিম বললে, 'এক কাজ করা যাক, ছুটি কেমন কাটালাম তা লিখে জানাই শিক্ষয়িত্রীকে।'

১) সবাই চ্যাঁচাল, 'ঠিক বলেছিস!' এবং তাই ঠিক হল ... ক্লিম গেল তার দিদিমার কাছে গাঁয়ে। চিঠিতে সে লিখলে:

২) "ডুবন্ত লোকদের আমি বাঁচিয়েছি। সবাই তারা খুশি। এক জন আমায় বললে, 'তুই না থাকলে ডুবেই মরতাম।'

৩) আমি বললাম, 'ছোঃ, আমার কাছে ও আবার একটা কাজ!' পঞ্চাশ কি একশ' জনকে আমি বাঁচিয়েছি। বেশিও হতে পারে।

৪) তারপর জলে ডোবা সবার বন্ধ হল। বাঁচাবার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। তখন চোখে পড়ল রেল-লাইনটা ভাঙা। গোটা একটা ট্রেনকে আমি থামালাম।

৫) গাড়ি থেকে নেমে লোকে ছুটে এল আমার কাছে। কোলাকুলি করে খুব তারিফ করলে। অনেকে আমার ঠিকানা চাইল, আমিও দিলাম।

৬) অনেকে আমায় তাদের ঠিকানাও দিলে। অনেকে কিছু কিছু উপহার দিতে চেয়েছিল আমায়, কিন্তু আমি বললাম, 'দয়া করে ওইটি করবেন না।

৭) অনেকেই ফোটো তুললে আমার। অনেকেই তক্ষুণি আমায় নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দিদিমাকে তো বলে রাখি নি।

৮) তারপর দেখলাম একটা ঘরে আগুন লেগেছে। সারা বাড়িতেই আগুন। 'ছুটে চলো!' বললাম নিজেকে, 'ভেতরে নিশ্চয় কেউ না কেউ আটকা পড়েছে।'

৯) চারিপাশে জ্বলন্ত কড়িবর্গা খসে পড়ছে। কয়েকটা পড়ল সামনে, কয়েকটা পেছনে। পাঁচটা পড়ল একেবারে আমার মাথার ওপর।

১০) বাড়ির ভেতর ছিল কেবল একটা বেড়াল। তাকে বাঁচাতে বাড়ির লোকেরা খুব বাহবা দিলে আমায়; তরমুজ খেতে দিলে।

১১) তারপর দেখলাম একজন বুড়িকে, রাস্তা পেরতে চাইছিল সে।

১২) জানতাম, বুড়োবুড়িদের হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলাম তার সাহায্যে।

১৩) বললাম, 'আসুন আপনাকে রাস্তা পার করিয়ে দিই।' বুড়িকে ওপারে পেণছে দিয়ে ফিরে এলাম।

১৪) তারপর আরো অনেক বুড়ি এল। তাদেরও আমি ওপারে পেণছে দিলাম। কিন্তু কয়েক জনের ওপারে যাবার দরকার ছিল না...

১৫) কিন্তু আমি বললাম, 'আমি আপনাদের ওপারে পেণছে দেব, তারপর আবার ফিরিয়ে আনব। তাহলে এই পারেই থেকে যাবেন!'

১৬) তিন বুড়ি কিছুতেই ওপারে যেতে চাইলে না, তাই তাদের আর সাহায্য করা গেল না।" এইখানেই চিঠি শেষ।

১৭) তারপর স্কুল খুললে প্রথম পাঠেই শিক্ষয়িত্রী অনেকের চিঠিই পড়ে শোনালেন। কিন্তু ক্লিমের চিঠিটি পড়লেন না। সত্যি, কেন বলো তো?

কার্টুন-ছায়াচিত্রের মৌল ধরনের একটি পত্রিকার নাম হল 'নাগরদোলা'। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় কয়েকটি করে ছোট আকারের মজাদার ছবি (কমিক-স্ট্রিপ)-গল্প ছাপা হয়। এগুলি হয় যেমন মজাদার তেমনই শিক্ষামূলক। আমাদের খুদে পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে এখানে আমরা পত্রিকাটি থেকে এইরকম সবচেয়ে মজাদার একটি ছবি-গল্প ছাপছি। চিত্রগল্পের এই ধারাবিবরণীটি তৈরি করেছেন পাঠ-লেখকদ্বয় আ. কুর্লিয়ান্দস্কি ও আ. হাইত্ (এঁরা দু'জন পর্যায়ক্রমিক কার্টুন-চিত্র 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি!'র পাঠ-লেখক হিসেবে খ্যাত), পরিচালক আ. পেত্রভ এবং শিল্পনির্দেশক আ. ভোল্কভ। আমাদের এই শিশুদের পাতাগুলির জন্যে ছবি এঁকে দিতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আ. ভোল্কভকেই। তবে গল্পটি আমরা নিজেরা না বলে এই ফিল্মের নায়ক দুর্ভাগা সফরকারীটিকে তার রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী নিজমুখে বলার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি...

প্রথম আগন্তুক

১) কেন মরতে আমি যে এই সফরে বেরোতে গেলাম কে জানে! তাঁবুর আশপাশে ঘাসের ওপর চমৎকার আয়েস করে শুয়ে আর দূর থেকে এই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে পারতাম। তাঁবু থেকে এই পাহাড়ের চূড়োর মরা গাছটা আর তার ডালে নাম-না-জানা কী যেন একটা পাখির বাসা কী যে চমৎকার দেখায় কী বলি!

২) চড়াইয়ের রাস্তাটা ক্রমশ খাড়াই হয়ে উঠছে আর এই পথে হাঁটা যে ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছে তা আর বলতে!.. দৈত্যের মতো আমি যদি তাল-ঢ্যাঙা লম্বা হতাম তাহলে দুই লাফে গিয়ে পেঁছতাম একেবারে পাহাড়ের চূড়োয়। কিংবা যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম তাহলে কী মজাই না হোত... যাই হোক, আমাকে কিছু-একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে...

৩) যাক, অবশেষে একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল! বাকি ছেলে-পিলেরা সবাই জঙ্গলে গেছে স্ট্রবেরি ফল তুলতে, একমাত্র আমিই বসে আছি এখানে আর কী করে বাকি পথটা পাড়ি দেয়া যায় তার উপায় ঠাওরাতে ভাবছি তো ভাবছিই... এই তো, ভাবতে-ভাবতে উপায়ও একটা পেয়ে গেছি! এই রুক-স্যাকটার ভেতরে ঢুকে বসলে কেমন হয়? নিজে দম বের করে হাঁটার চেয়ে কারও পিঠে চেপে যাওয়াটা কি অনেক ভালো নয়?

৪) এই তো কেমন রুকস্যাকের ভেতরে ঢুকে বসে কান পেতে বাইরের শব্দ শোনার চেষ্টা করছি... মনে হচ্ছে কে যেন আসছে না? খুঁশিতে ভারি-ভারি পা দাপাতে-দাপাতে? অবশ্য পায়ের আওয়াজ শুনে এত উতলা হবার কিছু নেই, দলে আমাদের জনকয়েক হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলে আছে বৈকি। যাক, এবার বেশ আয়েস করেই পাহাড়ে চড়া যাবে!

৫) হুর্‌রে, এবার চলতে শুরু করেছি! কেবল ভাবছি, যে-ছেলেটা আমায় বয়ে নিয়ে চলেছে সে এমন এপাশ-ওপাশ দুলতে-দুলতে চলেছে কেন? আচ্ছা, রুকস্যাকের ফাঁক দিয়ে একটু উঁকি দিয়ে দেখি তো — কোন বন্ধুটা আমায় পিঠে করে নিয়ে চলেছে! হরি হরি! এ তো ছেলে নয়, এ যে দেখি ভালুক!

৬) ভালুক দেখে আতঙ্কে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম যে ভালুকটাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর ফুটবলের মতো কী জোরেই-না একটা লাথি কষাল আমায়! আর এখন আমাকে নিয়ে রুক-স্যাকটা হাওয়ায় উড়ছে... মনে-মনে নামজপ করছি — যেন কোনো জলার জলে গিয়ে না পড়ি!

৭) তা, আমাকে নিয়ে রুকস্যাকটা শেষপর্যন্ত পড়ল গিয়ে কোথায়? — না, হুড়মুড় করে একটা এল্‌ক-হরিণের ডালপালাওয়ালা শিঙের ওপর! উঃ, এল্‌কের শিঙগুলো কী দারুণ শক্ত! কেন জানি না, একথা তো কখনও ভাবি নি!

৮) ওরে, থাম্‌, থাম্‌! আমাকে শিঙের আগায় এমন করে আর নাচাস না! উহু, ভয়ঙ্কর লাগছে! আরে, ও যে দেখি আমাকে ফেলে দিচ্ছে! এই সেরেছে!

৯) জানতাম, এ-ই হবে! হরিণটা আমায় আছড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আর কোথায় ফেলল? — না, সোজাসুজি একটা জলার মাঝখানে! ঝুপ করে রুকস্যাকটা এসে জলে পড়ল, তারপর আমাকে সুদ্ধ জলে বুড়বুড়ি কেটে তলিয়ে যেতে লাগল! এখন আমার চারপাশে দেখি ব্যাঙেরা তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর একটা সারস রুকস্যাকটাকে কী করে তার লম্বা ঠোঁটে বাগিয়ে ধরা যায় ধানীর মতো তারই উপায় ঠাওরাচ্ছে।

১০) সারসটা বেচারা রুকস্যাকটাকে মস্ত বড় একটা ব্যাঙ মনে করেছে। আরে, দেখতে-দেখতে ও যে রুকস্যাকের স্ট্র্যাপটা ঠোঁটে বাগিয়ে ধরল, আর এখন আমি রুকস্যাক সুদ্ধ উড়ে চলেছি আকাশে। এত উঁচু থেকে নিচে তাকিয়ে দেখতেও ভয় করছে যে। আরে-আরে, মনে হচ্ছে এবার যেন আমি পড়ে যাচ্ছি। ওমা, আমার কী হবে গো!

১১) এখন কোথায় এসে পড়লাম আমি? আহ্‌, এই তো এখানে এসে পড়েছি! সত্যি, ভাবতেও পারি নি যে সোজা এসে পড়ব পাহাড়ের চুড়োয় সেই মস্ত গাছটার ডালে পাখির বাসাটায়! আমাদের ছেলের দলটা এখনও কষ্ট করে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠছে, আর আমি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি পাহাড়ের মাথায়! আমিই প্রথম এসে পৌঁছলাম তাহলে! হুর্‌রে!

১২) আচ্ছা, কী জাতের পাখি সেটা যে এমন রোগাপটকা পলকা বাসা বানিয়েছে?

১৩) বাসা ভেঙেচুরে রুকস্যাকটা এখন প্রবল তাড়াতাড়ি থেকে আরও তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামছে, আর বলা বাহুল্য, রুকস্যাকের মধ্যে বসে আমিও উল্টোপাল্টা গড়িয়ে নামছি পাহাড় বেয়ে। বলতেই হয়, পাহাড় বেয়ে নিচে নামাটা ওপরে ওঠার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হয়।

১৪) অবশেষে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে এসে পড়লাম! রুকস্যাক থেকে বেরিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখলাম একবার। আর কথাটা হঠাৎই মনে হল আমার: বাব্বা, প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার কী যে জ্বালা!

বছর কয়েক আগে মুক্তি পায় এদুয়ার্দ উসপেনস্কির কাহিনী অবলম্বনে কার্টুন ফিল্ম 'কুমির গেনা আর তার বন্ধুবান্ধব'। সঙ্গে সঙ্গেই এই মিষ্টি কুমির আর তার বন্ধু 'অজ্ঞাত প্রাণী' চেবুরাশকা বাচ্চা দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অচিরেই বেরয় একই চরিত্র নিয়ে দ্বিতীয় ফিল্ম আর এখন তোলা হচ্ছে তৃতীয়। এর রচনায় আছেন লেখক এদুয়ার্দ উসপেনস্কি নিজে, পরিচালক রোমান কাচানভ, শিল্পী লেওনিদ শ্বার্তসমান—এ ছবিগুলি তাঁরই আঁকা।

কুমির গেনার নদী

১) ছুটেছে এক্সপ্রেস ট্রেন। গেনা আর চেবুরাশকা উঠেছে তাতে, যাচ্ছে দক্ষিণে, সমুদ্রতীরে। মনে ভারি আনন্দ, ভাবতেও পারে নি কী তাদের কপালে আছে। ওদিকে ওয়াগনের চালে বসে আছে তাদের পুরনো শত্রু শাপোক্লিয়াক বুড়ি, আর বসে আছে তো শুধু তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে নয়।

২) পোষা ইঁদুর লারিসকাকে দিয়ে ওদের টিকিট চুরি করার ফন্দি আঁটলে বুড়ি।

সুড়ুৎ! বাস, টিকিট উধাও। কুমির গেনা আর চেবুরাশকা কিছু কিছু খেয়ালই করে নি। এমন সময় এল চেকার।

— টিকিট!

কোথায় টিকিট!

৩) ওদের নামিয়ে দিলে পরের স্টেশনে। ওদের সঙ্গে নামল অদ্ভুত কী-সব লোক। গান গাইছিল তারা, পিঠে বইছিল মোটা মোটা ন্যাপস্যাক। ওহ্, কী জঘন্য লোক। বড়ো বেশি হল্লা করে। অথচ বনে চাই চুপচাপ।

৪) 'মস্কো এখান থেকে দু'শই কিলোমিটার, এক সপ্তাহে পেঁছে যাব!'

তবে ওরা তো আর জানত না যে শাপোক্লিয়াক বুড়ি তাদের পেছু নিয়েছে একটা রেলের ট্রলিতে। না, ওর হাত থেকে ছাড়ান নেই। হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। কোন দিকে যাবে, ডাইনে না বাঁয়ে?

৫) আর সে তো জানাই ছিল, গেল ভুল পথে। বনের মধ্যে গেনা, চেবুরাশকা তারপর বুড়ি শাপো-ক্লিয়াক আটকা পড়ল লোহার জাঁতিকলে। ওগুলো পেতে রেখেছিল ওই মন্দ লোকগুলো।

— দাঁড়াও ওদের দেখাচ্ছি!— হুমকি দিলে বুড়ি। জাঁতিকল-গুলো কুড়িয়ে নিল সে।

৬) সেগুলো সে পাতলে মন্দ লোকগুলোর ছাউনির কাছে। তারপর পিঁপড়ে-ঢিপি থেকে ছাউনি পর্যন্ত চিনির একটা পথ বানাল। বাস, শুরু হয়ে গেল যা হবার। কামড়ের চোটে ছাউনি সমেত ছোটাছুটি লাগাল লোকগুলো, খটখট করে উঠল জাঁতিকলের দাঁত হাউমাউ করে কঁকিয়ে উঠল সবাই।

'এ তো সবে শুরু' — বললে শাপোক্লিয়াক।

৭) সকালে গেনা আর চেবুরাশকা গেল নদীতে চান করতে। ডুব দিয়ে উঠতেই দেখে সারা গায়ে দাগ। পাড়ে ছোটাছুটি করছিল দাগ-ফুটকি ছেলেরা। বললে:

'ওখানে আছে চাকায় বসানো একটা রসায়ন কারখানা। নদীর জল নষ্ট করছে ওরাই।'

'এক্ষুনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব' — বললে কুমির।

৮) তাদের সঙ্গে যোগ দিলে শাপোক্লিয়াক। সারা রাত সে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল সেই মন্দ লোকগুলোর ওপর। তাতে নোংরা হয়ে যায় পোশাক। নদীর জলে কাচতে গিয়ে পোশাক হয়ে উঠল দাগ-ফুটকিতে ভরা। দারোয়ান ওদের ঢুকতে দিতে চাইছিল না, কিন্তু শাপোক্লিয়াক দুটো কথা বলতেই সে রাজী হয়ে গেল।

৯) — 'কে আপনারা?' — হুংকার দিলে ম্যানেজার, 'কাজে বাধাত করবেন না, আমায় এখন প্রধান রসায়নবিদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইতে হবে।'

'ও, বটে!' বললে গেনা, 'আমাদের কথাই শুনতে চান না। তাহলে নিজেদের ব্যবস্থা দেখতে হচ্ছে। হাজার হলেও আমি কুমির তো বটি।'

১০) জলে ডুব দিল গেনা। যে পাইপ দিয়ে নানান ফেনানি রং এসে পড়ত জলে, সেটা বন্ধ করে দিলে। তখন রঙে ভরে গেল কারখানা। ফটক দিয়ে হুড়মুড়িয়ে বেরুতে লাগল রঙমাখা রসায়নবিদেরা। শাপোক্লিয়াক ওদিকে প্রধান সুইচ ঘুরিয়ে দিলে। চাকা ঘড়ঘড়িয়ে কোথায় চলে গেল কারখানা।

১১) এদিকে জলের ভেতরে জালে জড়িয়ে পড়ল গেনা। এ জাল পেতে রেখেছিল ওই মন্দ লোকগুলো। চাঁচাল তারা:

'আরে ধরা পড়েছে। টেনে তোল। দুপুরের খাবারের জন্যে মাছ দরকার।'

'কিন্তু কুমিরের দরকার নেই কি?' — কড়া গলায় শুধোল গেনা।

'গেছিরে, বাঁচাও!' — বলে ছুটল বেআইনী 'জেলে'রা।

১২) 'বেশি দূরে যেতে হচ্ছে না — বললে শাপোক্লিয়াক।—লারিসকা পেছু ধর!'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মন্দ লোকগুলোকে জমা দেওয়া হল থানায়, তাদের জাঁতিকল, ন্যাপস্যাক আর কালশিটে সমেত — পথে আসার সময় বুড়ির হাতে ঠোকন খাওয়ার ফল।

১৩) গেনা আর চেবুরাশকা ফের গিয়ে পেঁছল সাব-স্টেশনে — শাপোক্লিয়াক ওদের টিকিট ফিরিয়ে দিয়েছিল যে। বন্ধুরাও এল বিদায় জানাতে।

'এই বাক্সটা তোমাদের জন্যে উপহার। আমাদের নদীর সব বাক্সরা আবার সবুজ হয়ে উঠেছে।'

১৪) এল ট্রেন। শাপোক্লিয়াকের টিকিট ছিল না, তাই সবাই একসঙ্গে চলল ছাদে চেপে।

ট্রেন ছুটল অনেক দূরে, দক্ষিণে, সমুদ্রতীরে।

চেবুরাশকার বন্ধুলাভ

চেবুরাশকা হল শিশুসাহিত্যিক এদুয়ার্দ উসপেনস্কির 'কুমির গেনা আর তার বন্ধুবান্ধব' নামক বইয়ের নায়ক। বইটির অবলম্বনে 'মুলতফিল্ম' স্টুডিয়োর পরিচালক রমান কাচানভ একটি পুতুল ফিল্ম তুলেছেন। শিল্পী লেওনিদ শুভারৎসমান তার দৃশ্যপট ও পুতুলগুলি বানিয়েছিলেন, তিনিই আমাদের শিশু পাঠকদের জন্য এই ছবিগুলিও এ'কে দিয়েছেন।

১। একবার আফ্রিকা থেকে কয়েক বাক্স কমলা লেবু এল। সমস্ত বাক্সেই কমলা লেবু পাওয়া গেল। কিন্তু একটা বাক্সে দেখা গেল কিছুই নেই, পড়ে আছে শুধু খোসা আর ছোট্ট এক অজানা কোন জন্তু চেবুরাশকা।

২। দোকানী ভেবে পেল না চেবুরাশকাকে নিয়ে সে কী করবে। শহরের নানা জায়গায় সে ঘুরল তাকে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত এল এক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মালের দোকানে।

৩। সেইখানেই কাজ জুটল তার, কেননা দেখতে ছিল সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড পুতুলের মতো। জানলায় তাকে দেখে লোকের চোখ পড়ত দোকানটায়। থাকত সে একটা পোড়ো টেলিফোন বুথে।

৪। শহরটায় থাকত গেনা নামে এক কুমির। কাজ করত চিড়িয়াখানায়। কোনো বন্ধু ছিল না তার, ভারি একা লাগত। তাই কাজের পর একটু আমোদ করার জন্যে সে সাবানের ফেনা দিয়ে বুদ্বুদ বানাত।

৫। 'না, আর নয়,' একদিন বললে গেনা, 'বন্ধু একটা জোটাতেই হবে। বিজ্ঞাপন দিলে যে তার বন্ধু চাই। তা দেখে তার কাছে এল ছোট্ট মেয়ে গালিয়া আর আমাদের চেনা চেবুরাশকা।

৬। ভারি আনন্দে রইল গেনা, গালিয়া আর চেবুরাশকা। কিন্তু সঙ্গীছাড়া লোকজন জীবজন্তু শহরে তো আরও অনেক। তাদের সাহায্য করবে ঠিক করলে এরা। বানাবে 'বন্ধু-ভবন'।

৭। 'আমিও একটু হাত লাগাব?' পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে 'চন্দ্র' নামে এক সিংহ।

'নিশ্চয়,' সায় দিলে সবাই, কাজ চলল পুরো দমে।

৮। কাজ চলত আরো জোরে, কিন্তু বুড়ি শাপোকলিয়াক আর বাজি দেখানো ইঁদুর লারিসকা শুরু করে দিলে লড়াই।

৯। কত কাণ্ডই না করলে বুড়িটা, প্রত্যেক দিন তরমুজের খোল ছুঁড়ে দিত বাড়ি বানাবার জায়গায়, সুযোগ পেলেই ইট চুরি করত।

১০। তাহলেও বাড়ি উঠল সময় মতোই। কেননা যাদের বন্ধু দরকার, সবাই তারা হাত লাগিয়েছিল — জিরাফ আন্যুতা, কুকুর তোবিক, সিংহ চন্দ্র আর একজন ভারি বুদ্ধিমান সঙ্গিহীন একটা লোক — আলেক্সেই ইভানভিচ।

১১। গৃহ প্রবেশের দিন কুমির গেনা বললে, 'যারা বন্ধুর মতো চলবে, তাদের সবাইর নাম আমি রেজেস্ট্রি করে নিতে রাজী।' কিন্তু বাড়ি তৈরির সময়েই তো সবাই বন্ধু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ভাবেই নি কেউ।

১২। কিন্তু বুড়ি শাপোকলিয়াক যে এসে হাজির হবে, সেটা একেবারেই কেউ ভাবে নি।

'পালা! পালা! যে যেদিকে পারিস,' চেঁচিয়ে উঠল চেবুরাশকা।

১৩। কিন্তু এবার বুড়ি জ্বালাতে আসে নি। তারও ইচ্ছে হল সবার সঙ্গে থাকবে। কেননা সেও যে একলা। বাজি দেখানো ইঁদুরকে কি আর সই বলে ধরা যায়? শাপোকলিয়াক যে চিঠিটা এনেছিল তাতে লেখা ছিল: 'আর করব না। ইতি শাপোকলিয়াক।'
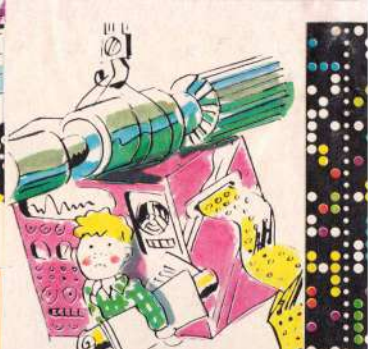
না জানি কী আরো হবে গো!

Припев

1 2 3.

১) স্কুলেতে আমার প্রথম বছর,
তবুও পড়ার কী ভীষণ চাপ।

৫) ধুয়া: না জানি কী আরো হবে গো,
না জানি কী আরো হবে গো,
না জানি কী আরো হবে গো,
উহ্-উহ্-উহ্!

৯) নেইকো সুযোগ, মেলে না হাওয়াও,
চালাই সিনক্রোফেজট্রন। (ধুয়া)

বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এই মজার ছড়াটি লিখেছেন কবি ইগর শাফেরান, সুর দিয়েছেন এদুয়ার্দ হানোক। আর জনপ্রিয় গায়িকা আল্লা পুগাচভা তা পরিবেশন করার পর স্কুলের ছাত্রছাত্রী আর তাদের পিতামাতা, কিছু কিছু শিক্ষকও 'না জানি কী আরো হবে গো' ধুয়াটা ধরেছেন। আর শিল্পী আনাতোলি সুখোভের কথা আর কী বা বলি, এ পাতার ছবিগুলি ও'রই আঁকা।
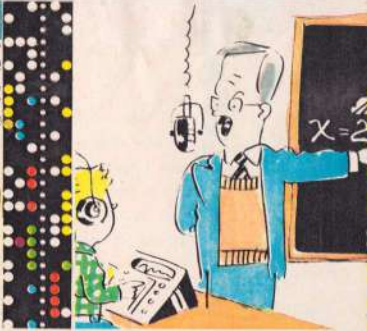
২) স্কুল যেন নয়, কলেজ জবর,
ছাড়তে দেয় না এতটুকু হাঁপ।

৩) যে সমীকরণ দেন মাস্টার
'এক্স-টেক্স' দিয়ে অজ্ঞাত রাশি,

৪) তা সব কষতে বাঘা প্রফেসার
কেঁদেই বলবে, আমি তবে আসি।
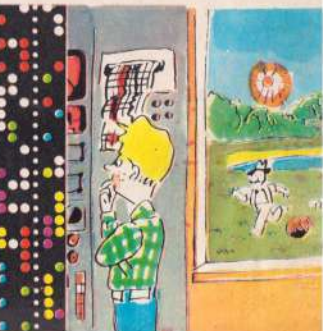
৬) আরো কী বিপদ দেখে যাও এসে,
লিখি যে রচনা, তবে বলি শোনো,

৭) তেমন রচনা আমার বয়েসে
লেখেন নি তলস্তয়ও কখনো।

৮) খেলাধুলো গেছে, যাই না কোথাও,
বুক ভরে শ্বাসে নেব যে ওজন বায়ু,

১০) স্কুলেতে আমার প্রথম বছর, তবুও পড়ার কী ভীষণ চাপ।
স্কুল যেন নয়, কলেজ জবর, ছাড়তে দেয় না এতটুকু হাঁপ।

১১) হয়রান হয়ে পোশাক ছেড়ে
ঘুমের সময় পাই বারোটায়।

১২) চট করে যদি ওঠা যেত বেড়ে...
শৈশব থেকে ফিরতেই চাই। (ধুয়া)

মজাদার ছবি

২৫ বছর আগে স্বনামধন্য সোভিয়েত কবি সামুইল মারশাক 'ভেসেলিয়ে কার্তিন্‌কি'(মজাদার ছবি) পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, সোভিয়েত পত্রপত্রিকার বৃহৎ পরিবারে দেখা দিল সবচেয়ে ছোটোদের জন্য একটি পত্রিকা। বর্তমানে শিশু পত্রিকার সংখ্যা ৪২, বছরে বেরয় ৪১০টি সংখ্যা, আর মাসে আড়াই কোটির বেশি কপি। তার মধ্যে 'ভেসেলিয়ে কার্তিন্‌কি'র সংখ্যাই হল প্রায় ১০ লক্ষ।

পত্রিকায় আজ ২৫ বছর রয়েছে হাসিখুশি লোকেদের আন্তর্জাতিক আসর, ছোটোদের প্রিয় বইগুলি থেকে তার নায়কেরা আবির্ভূত হয় এই পত্রিকাটির পাতায়: ইতালীয় সাহিত্যিক জান্নি রোদারির রূপকথা থেকে চিপোলিনো, অ্যান্ডারসনের কাহিনী থেকে দুইমোভোচকা, চেক শিল্পী ইর্জি ত্রেন্‌কির বই থেকে গুর্ভিনেক, রুশী রূপকথার পেত্রুশকা, সোভিয়েত সাহিত্যিক আলেক্সেই তলস্তয়ের কাহিনী কাঠের ছেলে বুরাতিনো। নিকোলাই নোসভের কাহিনী থেকে পত্রিকাটি পেয়েছে নেজনাইকাকে। জর্জিয়ার কার্টুন ফিল্ম শিল্পীরা বানিয়েছেন সর্বকর্মা সামোদেলকিনকে। শিল্পী আ. ভভিকোভার বিচিত্র কাহিনী আজ হাসিখুশি লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে পাঠকদের।

ছোট্ট কুঠি

১) মাঠে ছোট্ট এক কুঠি। নয়কো নিচু, নয়কো উঁচু।

২) কাছ দিয়ে যাচ্ছিল শিল্পী পেন্সিল:
— কুঠিটায় থাকব, ছেলেপিলেদের জন্যে হাসিখুশি ছবি আঁকব।

৩) কাছ দিয়ে যাচ্ছে বাজনদার পেত্রুশকা:
— আমিও থাকব কুঠিতে। বাজাব অ্যাকর্ডিয়ান, ছোটোদের জন্যে বাঁধব মজাদার গান।

৪) যাচ্ছে সর্বকর্মা সামোদেলকিন:
— আমিও থাকব কুঠিতে, নইকো আমি ফেলনা, বানাব মজার খেলনা।

নেজনাইকার ধাঁধাঁ।
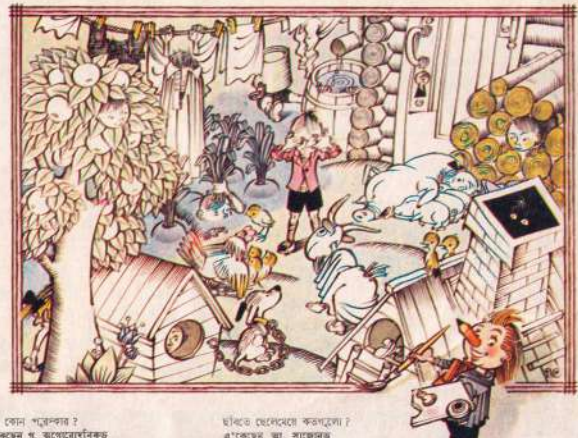
মাছ ধরলে কে?
এঁকেছেন ভ. গশ্‌কো

বার করো তো বাড়ি যাবার নিরাপদ রাস্তা।
এঁকেছেন ল. ফিরিলোভা

৫) যাচ্ছিল বুরাতিনো:
— আমিও থাকব কুঠিতে। এইতো, দেখাব পুতুল নৃত্য।

৮) যাচ্ছিল দুর্মুমির পান্ডা নেজনাইকা:
— আমিও কুঠিতে থাকব। বলব যত হাঁদা, জবাব দে তো ধাঁধার।

৯) যাচ্ছিল দ্যুইমোভোচকা:
— কুঠিতে থাকব আমিও। ছোটোদের আমি বলব, শোন, মান্যি করবি যারা গুরুজন।

৬) যায় গল্পদাদু গুর্ভিনেক:
— আমিও কুঠিতে থাকব, শোনাব মজার গল্প।

৭) যাচ্ছে ফক্কর চিপোলিনো:
— আমিও থাকব কুঠিতে। খেলব কিছু খেলা, ফক্কারিও মেলা।

১০) হাসিখুশি লোকেরা সব কুঠিতে থাকতে লাগল। বার করলে পত্রিকা। নাম তার, বোঝাইতো সবই — 'মজাদার ছবি।'

কার কোন পুরস্কার?
এ'কেছেন গ. অগোরোদনিকভ

ছবিতে ছেলেমেয়ে কতগুলো?
এ'কেছেন আ. সাজোনভ

আনিয়া ইউফেরোভা, ৭ বছর, সো-ভিয়েত ইউনিয়ন। 'পুঁতিওয়ালা কর্মরত'

দেখতে জানি জগৎটাকে

ইভ্যান কার্লোস অর্‌দোনিয়েস মার্ত-নেস, ১২ বছর, মেক্সিকো। 'মহাকাশচর'

সারা দুনিয়ার শিশু-শিল্পীরা সম্প্রতি 'দেখতে জানি জগৎটাকে' এই নামের বাচ্চাদের ছবিয়ের তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এর আগের দুটি প্রতিযোগিতার মতো এবারের প্রতিযোগিতাটিও সংগঠিত করে সোভিয়েত ইশকুলের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব সংবাদপত্র 'পিওনের্‌স্কায়া প্রাভ্‌দা'। এ-ব্যাপারে পত্রিকাটির সঙ্গে সহযোগিতা করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও জন-সংগঠন।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে, 'কী আঁকবে তুমি?' এর উত্তর প্রতিযোগিতার শিরনামেই ঠারেঠোরে বলে দেয়া হয়েছে — অর্থাৎ, আঁকবে তোমার চারপাশের জগৎকে।

দুনিয়ার ৭৫টি দেশ থেকে যত ছবি আসে তা সংখ্যায় ৩ লক্ষের কম হবে না। বিশিষ্ট সব শিল্পী আর শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক বিচার-কমণ্ডলী বেশ কড়াভাবে বিচার করেও সম্প্রতি মস্কোয় অনুষ্ঠিত ছবির প্রদর্শনীটির জন্যে এই ৩ লক্ষ ছবির মধ্যে থেকে সেরা শিল্পকাজগুলি বেছে নিতে যে প্রায় মাস ছয়েক সময় লাগিয়ে দিয়েছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বেছে-নেয়া এই সব ছবির মেলা বসে এরপর মস্কোর শিল্প-আকাদমিতে। আকাদমিতে সাধারণত পরিণত ওস্তাদ শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে 'দেখতে জানি জগৎটাকে' নামের প্রদর্শনীটি আকাদমির অন্য যে-কোনো ছবির প্রদর্শনীর মতোই জনপ্রিয় হয়েছিল। কেবল এবারে তফাত ছিল এইটুকু যে দর্শকদের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক ছিল শিল্পীদের মতো বয়সে কাঁচা ছেলেমেয়েরা।

শিল্প - আকাদমিতে প্রদর্শিত ১,৫০০ ছবির মধ্যে মাত্র কয়েকখানির প্রতিলিপি এই পৃষ্ঠাগুলিতে ছাপা হল। গোটা প্রদর্শনীটি হয়ে উঠেছিল ঘুরে-ঘুরে দুনিয়া দেখার এক অবিস্মরণীয় যাত্রাপথ।

ভ. সেভেরিয়ানোভা

চৌঁর রবার্টস, ১৪ বছর, গ্রেট ব্রিটেন। 'মাছধরা' হুয়ানা দা লা কারিদাদ মরুহন্দা, ১২ বছর, কিউবা। 'আমার মনের মতন খেলা' ইউ. উইলসন, ১০ বছর, নিউ জিল্যান্ড। 'আদিবাসীরা'

◀ হ. শ্মিড্‌ট, ৬ বছর, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। 'চিমনি-পরিষ্কারক'

ম. বাহনদ্বো, ১১ বছর, ▶ মঙ্গোলিয়া। 'জাতীয় সংগ্রাম'

ই. ফেরিদুন, ১০ বছর, তুরস্ক। 'আমাদের পরিবার'

ই. ইকেশ, ৬ বছর, হাঙ্গেরি। 'ছাদের ওপর বেড়ালরা'

উয়েনো তোকাকো, ৭ বছর, জাপান। 'ঠাকুর্দা'

কারোল, ৫ বছর, ফ্রান্স। 'ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা' ▼

রুজান শিভিউ, ৯ বছর, রুমানিয়া। 'দুনিয়ার খোকাখুকুদের মধ্যে মৈত্রী' ▶

◀ গ্রেগরি কোহেন, ৭ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'শহর'

ম. গুস্তু, ৭ বছর, আর্জেন্টিনা। 'বাইসাইকেলে আমার ভাই'

লো'হ ইয়াক্‌ ইয়াক্‌, ১১ বছর, সিঙ্গাপুর। 'সে-শহরে আমার বাস' ▼

ইভান মোরেনো কান্তানেদা, ৮ বছর, পেরু। 'বাবা' ▲

ইন্দু আগরওয়াল, ১০ বছর, ভারত। 'বাচ্চাদের একটা মেলা'

ই. ক. কাজী, ৬ বছর, বাংলাদেশ। 'বেড়ানোর সময়'

◀

এঁকেছেন: ত. কলিউশেভা

ধাঁধা

সেমিওন পিভোভারোভ

হয় না কি অভিমান:
আবহাওয়া যদি ভালো হয়
ওঁরা ওকে ভুলে যান,
কোন এক কোণে পড়ে রয়।
আর যেই
বাদল ঘনায়,
মনে পড়ে তখন তাকেই,
সাথে নিয়ে যায় রাস্তায়।
(ছাতা)

এঁকেছেন: ভ. বুনাকমান

– এ বাড়িটা হবে আমার!

– না, আমার!

– ওটা আমার নিজেরই দরকার!

লিউদমিলা উলিয়ানিৎস্কায়া

নাদুসনুদুস খোকা,
মাথায় মখমলী টোকা,
ছেলের দল এল ছুটে,
তাকে নিয়ে গেল লুটে।
(ব্যাঙের ছাতা)

এঁকেছেন: ইউ. ফিওদরোভ

'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি'।
এঁকেছেন : স. আলিমোভ

এবার
আমাদের পাতায়
'মজার মজার ছবি'
পত্রিকা

Весёлые картинки

বিশ বছর আগে বেরিয়েছিল 'মজার মজার ছবি' নামে সরস শিশু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গেই তা শিশুদের তারিফ পায়। মজাদার সব লোক থাকে পত্রিকায়—যাদুকর কলম, সর্বকর্মা, পেন্সুশকা, দিউমভোচকা। পেনসিল শেখায় আঁকতে, সর্বকর্মা নানান খেলনা বানাতে, পেত্রুশকা শোনায় যত রাজ্যের মজাদার কাহিনী আর দিউমভোচকা দেখায় কী করে তৈরি করতে হয় পুতুলের জামা।

'মজার মজার ছবি' পত্রিকাটি চমৎকার সব খেলা আর অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে ছোটোদের। সেরা ছবি আর রসিকতার প্রতিযোগিতা হয় এখানে, ছেলে-মেয়েরা সাগ্রহে পাঠায় তাদের আঁকা, লেখা, কবিতা। তবে তাই সব নয়। মা আর বাবার পেশা, আমাদের স্বদেশ কী সাধনায় অঙ্গীকৃত, সজাগতা, সহৃদয়তা, সততা নিয়ে আমরা ছোটোদের সঙ্গেও বড়োর মতো আলাপ করি।

ন. ইভানোভা, প্রধান সহসম্পাদিকা

'শালগম'।
এঁকেছেন : ত. ইগনাতিয়েভা

রূপকথার রাজ্যে ভোভকা

এক যে ছিল ছেলে, নাম তার ভোভকা। এতই সে আলসে যে ঘুমটি ছাড়া আর সবই তার কাছে কাজ। তবে টেলিভিজনে দেখানো নানা রূপকথা থেকে সে জানত যে এমন এক রাজ্য আছে যেখানে কিছুই করতে হয় না, অথচ সবই মেলে। তাই ইশকুলের গ্রন্থাগার থেকে যখন তাকে একটা বই দেওয়া হল 'নিজে নিজে করো', ও আপত্তি করলে। নিজে নিজে কিছুই যে সে করতে চায় না। কিন্তু পরে ভোভকার কী ঘটল সেটা তোমরা জানার আগে বলে রাখি তার ভাগ্যকথা শুনিয়েছেন লেখক ভ. করোস্তিলেভ, শিল্পী ব. স্তেপানৎসেভ আর ডায়াফিল্ম স্টুডিও।

১) 'বুঝেছি,' বললেন গ্রন্থগারিকা আন্না ইভানভনা, 'তুই যেতে চাস সব পেয়েছির দেশে। চেষ্টা করা যাক। তবে সেখানে যেতে পারা যায় কেবল ছবি হয়ে।'

২) 'রূপকথা' বইয়ের মলাটে তিনি আঁকলেন ভোভকার ছবি। 'আপনি যাদুকরী!' বললে ভোভকা। 'কেননা "নিজে নিজে করো" বইটা আমি প্রায়ই পড়ি, নে এবার চলে যা সেই দেশে।'

৩) রূপকথার এক দেশে পে'ছিল ভোভকা। দেখে, বেড়ায় রঙ দিচ্ছে রাজা। 'এ দেশে লোকে কাজ করে নাকি?' অবাক হল ভোভকা। 'হ্যা, এখানে রাজাকেও বছরে একবার খাটতে হয়।'

৪) 'খাটতে আমি চাই না,' বললে ভোভকা। রাজা তাতে এমন রেগে গেল যে লাফিয়ে উঠল সিংহাসনে। হুঙ্কার দিলে, 'গর্দান নাও এই আলসেটার, নইলে কুড়েমি রোগ ছড়াবে।'

৫) কোনোক্রমে পালিয়ে ভোভকা গিয়ে পে'ছিল সাগরতীরে। ডাকতে লাগল সোনার মাছকে, সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে যে। মাছ এসে বললে, 'কে আমায় ডাকে, কী চাই?'

৬) 'আমি চাই!..' তৎক্ষনি চেঁচিয়ে উঠল ভোভকা। 'চাই, চাই!' ভেংচি কাটল মাছ, 'আমায় যারা ধরে আমি কেবল তাদের ইচ্ছা পূরণ করি। আর তুই জাল বুনেছিস? ফেলেছিস তা নীল সাগরে? ধরেছিস আমায়? আলসেদের জন্যে আমি কিছু করি না।'

৭) 'কোরো না, বয়ে গেল!' রাগ হল ভোভকার, 'তোকে ছাড়াই আমার চলবে।' কিন্তু এই কথা বলতে না বলতেই প্রকাণ্ড এক ঢেউ উঠে ভোভকাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল পাতাটা থেকে।

৮) উঠে দাঁড়াল ভোভকা, দেখে একসঙ্গেই তিন মনীষিণী ভাসিলিসা। ভোভকাকে দেখে মায়া হল তাদের, দেখিয়ে দিলে সব পেয়েছির দেশে যাবার রাস্তা।

৯) সে দেশে ঢোকার মুখে একটা প্যাটরা, তাতে বসে আছে একই চেহারার দুজন কুমার। 'হুকুম কর! বললে কুমারেরা, 'সব করে দেব তোর জন্যে।'

১০) 'আমি চাই কেক, আর আইসক্রীম।' হাঁ করলে ভোভকা... কিন্তু অমন মিঠে জিনিসগুলো সবই কেন জানি পড়ছিল দুই কুমারের মুখে। 'আমরা তোর হয়েই চিবিয়ে দিচ্ছি,' বললে ওরা।

১১) প্যাটরাটা নিয়ে ভোভকা চলল সব পেয়েছির দেশে। যেতে যেতে দেখে এক চুল্লি। 'চুল্লি, ও চুল্লি, আমায় কিছু খেতে দাও।' 'তুই তাহলে কাঠ ফাড়, ময়দা মাখ।'

১২) কাজে লাগল ভোভকা। তবে প্রথমটা বিশেষ কিছুই উৎরাল না। তখন সে হাঁক দিলে, 'এই, প্যাটরার তোরা, "নিজে নিজে করো" বইটা আমায় এনে দে। জলদি!'

১৩) তখখুনি বই এসে গেল তার হাতে। আগাগোড়া বইটা পড়ে ফেলতেই সবকিছুতে ভোভকার হাত খুলে গেল। রূপকথায় সবই তো হয় খুব তাড়াতাড়ি!

১৪) কাঠ ফাড়লে ভোভকা, ময়দা মাখলে। অমন খাশা পিঠে ভোভকা জীবনে কখনো খায় নি। তার কারণ নিশ্চয় এই যে এবারটি সে সবই করেছে নিজে নিজে।

১৫) দিনের পর দিন যায়। সব পেয়েছির দেশে ভোভকা শিখে ফেললে অনেক কিছু। আর শেখার পর বিদায় নিলে নতুন বন্ধুদের কাছে, রূপকথার দেশ থেকে রওনা দিলে ঘরমুখো।

১৬) দেখছ তো, আন্না ইভানভনা ঠিকই বলেছিলেন। এখন আমাদের ভোভকা নিজেই জানে যে 'নিজে নিজে করো' বইখানা আশ্চর্য যাদুকরী বই।

এই নামে একটি কার্টুন ফিল্ম তুলেছেন পরিচালক প. নোসভ আর শিল্পী ক. কার্পভ। রুশী লোককাহিনীগুলোর মতো এ ফিল্মেও শেয়াল সেয়ানা ধড়িবাজ আর ভালুক ভালোমানুষ, সরল-বিশ্বাসী। তবে আমাদের ছোট্ট পাঠকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে: শেয়াল শাস্তি পাবে। তাই তো সব গল্পেই হয়।

শেয়াল আর ভালুক

১) ভালুক বানালে একটা কাঠের মোটর সাইকেল, তার পাশে জুড়লে সাইড-কার। তাতে চড়ে তাকে যেতে দেখে শেয়াল বললে 'সাইড-কারটা আমায় বিক্রি করে দে।' 'ওটা যে এক চাকার, মোটর সাইকেলের সঙ্গে জোড়া, যাবি কী করে?'

৩) ঘাবড়ে গেল ভালুক। শেয়াল যেখানে বললে সেখানে তাকে পেঁছে দিয়ে নিজে গেল সে প্যাঁচার কাছে, বনের সব আইন তার জানা। 'শেয়ালকে সাইড-কার বেচলাম, এখন সে মোটর সাইকেলও দখল করে বসেছে।'

২) শেয়াল বললে, 'সেটা তোকে ভাবতে হবে না।' রাজী হল ভালুক, রসিদ লিখে দিলে, 'মোটর সাইকেলের সাইড-কার বিক্রি করে দিলাম শেয়ালকে।' পরের দিন সকালে এল শেয়াল, সাইড-কারে বসে দাবি করলে, 'নিয়ে চল আমায়, আমি সাইড-কার কিনেছি মোটর সাইকেলের।'

৪) মাথা নাড়লে প্যাঁচা, সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে বললে, 'সবই আইন-মোতাবেক। সাইড-কার আর মোটর সাইকেলের নম্বর এক। তাই তা আলাদা করা চলবে না।' কী আর করে ভালুক।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

৫) তাই মেনে নিলে সে। শেয়ালের মর্জি মতো তাকে পে'ছে দেয় কখনো মাছ ধরতে, কখনো দূরের বনে ব্যাঙের ছাতা তুলতে। শেয়াল নেমে হুকুম দিয়ে যায় তার জন্যে অপেক্ষা করতে।

৬) একদিন ভাল্লুক শেয়াল-কে নিয়ে গেল নেকড়ের কাছে নেমন্তন্নে। ছায়ায় খাবার সাজিয়ে নেকড়ে শেয়ালকে ডাকলে। শেয়া-লকে তোয়াজ করে নেকড়ে, গিটার বাজিয়ে গান শোনায়।

৭) ওদিকে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার হুকুম হয়েছে ভাল্লুকের ওপর। ভাবে সে, ব্যাপার কী, সাইড-কারের সঙ্গে শুধু মোটর সাইকেল নয়, আমিও জোড়া মোটর সাইকেলের সঙ্গে। রাগ হয়ে গেল তার।

৮) নেকড়ের সঙ্গে শেয়াল এল মোটর সাইকেলের কাছে। দেখে — ভাল্লুক নেই কোথায়। হাঁক দিলে, সাড়া এল না। আরো জোরে চাঁচাল — না, ভাল্লুক নেই।

৯) কম রাগা রাগে নি ভাল্লুক। ভাবলে, মোটর সাইকেল আর সাইড-কার গেছে, যাক গে। সুখ তো কেবল মোটর সাইকেলেই নয়, তাছাড়াও দিন কাটবে। চলে গেল সে বাড়িতে।

১০) শেয়াল আর নেকড়ে-কে নিজেদেরই চালাতে হল সাইকেল। নেকড়ে বসলে সীটে, শেয়াল সাইড-কারে। ঢালু বেয়ে নামতে সোজা এক ওক গাছের দিকে ছুটে চলল সাইকেল। নেকড়ে গাড়ি ঘোরাতেও পারে না, ব্রেক কষতেও পারে না...

১১) পুরো স্পীডে তারা গিয়ে ধাক্কা খেল গাছে। চুরমার হয়ে গেল মোটর সাইকেল। নেকড়ে ছিটকে পড়ল এক দিকে, শেয়াল অন্য দিকে। তাও রক্ষে যে হাড়গোড় ভাঙে নি।

১২) ভাল্লুক ওদিকে কাঠের এক বাইক বানাল। একদিন আবার শেয়ালের সঙ্গে দেখা। শেয়াল বললে, 'তোর বাইকের কেরিয়ারটা আমায় বেচবি?' ভাল্লুক বললে, 'অমনি-অমনি দিয়ে দেব। বস।'

১৩) জোরে প্যাডেল চালা-তে চালাতে ভাল্লুক ঢালু বেয়ে উঠল সেতুর ওপর। কাঠের গুঁড়ির সেতু, বেদম ঝাঁকুনি খেতে লাগল বাইক। আর বসে থাকতে পারল না শেয়াল, কেরিয়ার সমেত পড়ল জলে।

১৪) ভাল্লুক চেঁচিয়ে বললে, 'কেরিয়ারে বসে যত পারো চড়ে বেড়াও শেয়াল। তবে কেরিয়ারের সঙ্গে আর যা-কিছু আছে সেটা নিজেই বানিয়ে নিও। আমি তোমার নোকর নই।'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

'সায়্‌জম্‌স্টফিল্ম' স্টু-ডিও থেকে এই নামে বেরিয়েছে একটি কার্টুন ফিল্ম। চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক এদ্‌য়ার্দ উসপেনস্কি এবং সমান খ্যাত পরিচালক রোমান কাচানোভ, তিনি এই ফিল্মটিরও পরিচালক। প্রযোজক শিল্পী এলেনা প্ররোকোভা। আর আমাদের পত্রিকার জন্যে ছবি এ'কেছেন কনস্তান্তিন কার্পভ।

যাদুকর বাহরামের সম্পত্তি

(১) ইশকুল যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি মাশার। এতই সে তাড়াতাড়ি করছিল যে ইশকুলে যাবার ইউনিফর্ম-ফ্রকটিও পরা হয়ে উঠল না।

(২) কিন্তু আচমকা একটা ব্যাপার না ঘটলে হয়ত সে ক্লাস শুরু হতেই পে'ছিতে পারত। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল মাশার পায়ের নিচের ঢাকনাটা, মাটির তল থেকে ভেসে এল ঘা মারার চাপা শব্দ। জল যাবার ঝাঁঝরিতে কান পেতে শুনতে লাগল মাশা। তখন থেমে গেল শব্দটা।

(৩) মাশা জানত না যে সেই সময় পাতাল পুরীতে বুড়ো যাদুকর বাহরাম তার বান্দা জিল-জিলিয়াদানেকে হুকুম দিয়েছিল মাটির ওপরে উঠে চালাক-চতুর একটি ছেলেকে নিয়ে আসতে। পাশের গুহায় তার বিরাট হাতুড়ি মারছিল এই দানোই। বাহরাম বললে, 'আমি বুড়ো হয়েছি, ছেলেটা হোক আমার সম্পত্তির মালিক।'

(৪) ঝেনের ঝাঁঝরি দিয়ে উঠে দানো দেখতে পেলো মাশাকে, তাকে ভাবলে খোকা — মাশা যে পায়জামা বদলে ফ্রক পরার সময় পায় নি। জিল-জিলিয়া ভাবলে, 'এই রকমটিই আমার দরকার।' মাশা জিজ্ঞেস করলে 'আপনি বুঝি ড্রেন পাইপ পাতছেন? দেখব একটু?' মাশা ঝাঁঝরিতে উ'কি দিতেই জিল-জিলিয়া তাকে ধরে নিয়ে গেল বাহরামের কাছে।

(৫) বাহরাম বললে 'খাসা ছেলে। নামতা জানো?' 'জানি, বললে মাশা, 'পাঁচ-পাঁচে প'চিশ। ছ'য়-ছ'য়ে ছত্রিশ। সাত-সাতে সাত-চল্লিশ।' 'চমৎকার, খুশি হয়ে উঠল বুড়ো, তুই হবি আমার ওয়ারিস।' 'না, না, চে'চিয়ে উঠল মাশা, আমি বাড়ি যেতে চাই!' কে'দে ফেলল সে, বইয়ের ব্যাগটা সে ছুঁড়ল যাদুকরের দিকে।

(৬) 'লজ্জার কথা! খোকা কিনা কাঁদছে খুকির মতো!' 'আমি তো খুকিই।' মেয়েটিকে ভালো লেগে গেল বাহরাম আর জিল-জিলিয়ার। ওর বদলে খোকা আনার কোনো ইচ্ছেই হল না তাদের। শুধু ভালো লাগল না মাশার। চেয়েছিল পালাতে, কিন্তু বুড়ো যাদুকর মন্ত্র পড়তেই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙড় বন্ধ করে দিলে গুহা থেকে বেরুবার পথ।

(৭) 'যতই করো পালাব।' এই ঠিক করে মাশা প্রকৃতিবিদ্যার পাঠ্যবইটি খুলে পড়া করতে লাগল। মাশার পেছন থেকে উঁকি দিয়ে বইয়ে গরুর ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল জিল-জিলিয়া। বললে 'আশ্চর্য জীব জায়গাপনা, চেয়ে দেখুন।' যাদুকরেরও ভালো লাগল ছবিটা। যাদুমন্ত্র পড়লে সে...

(৮) ...অমনি ছবিতে যা ছিল, গরু, রসালো ঘন ঘাস, গাছপালা, নীল সায়র — সবই এসে গেল গুহায়। ঘাস চিবাতে লাগল গরু আর জিল-জিলিয়া শুঁকতে লাগল ফুলের গন্ধ, হাত বুলোতে লাগল গাছের কাণ্ডে।

(৯) বুড়ো যাদুকরের আনন্দের আর সীমা নেই। ইচ্ছে হল চান করবে। আলখাল্লা ছেড়ে সায়রে ডুব দিতে যাবে, এমন সময় গরু বাহরা-মের দিকে এমনভাবে শিঙ বাগিয়ে ছুটে গিয়ে গুঁতো মারল যে...

(১০) ...যাদুকরকে সায়র পেরিয়ে লটকে দিল একটা গাছে। 'আমার দিকে ওটা এমন তেড়ে এল কেন?' জিজ্ঞেস করলে যাদুকর। মাশা বললে 'কারণ তোমার ইজের লাল রঙের, গরুরা ও রঙটা ভালোবাসে না।' অমনি বাহরাম মাটিতে নেমে আলখাল্লা জড়াল। মাশা বললে 'এবার আমায় যেতে দাও।' 'অমন বুদ্ধিমতী মেয়েকে? কিছুতেই না!' ফের মন্ত্র পড়লে যাদুকর...

(১১) ...অমনি অদৃশ্য হল সব। মাঠ, গরু, বাহরাম — কিছুই আর নেই। অন্ধকার গুহায় মাশা শুধু একলা। খেলনা বেলচা নিয়ে সে সুরঙ্গ পথ খুঁড়তে লাগল। তাড়া-তাড়ি খুঁড়ে ভাবছিল শিগ্গিরই বেরিয়ে আসবে, কিন্তু গিয়ে পড়ল পাশের গুহায়।

(১২) সেখানে কাজ করছিল জিল-জিলিয়া। মাশাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল সে। মাশা জিজ্ঞেস করলে 'কতদিন কাজ করছ এখানে?' 'হাজার বছর।' 'কখনোই ছুটি নাও নি?' 'ছুটি আবার কী?' 'প্রত্যেকেরই বছরে এক মাস করে ছুটি পাওয়ার কথা।' মাশা গুনে দেখল 'তোমার তাহলে জমেছে তিরাশি বছর ছুটি।' 'ঠিক আছে, চললাম ছুটিতে', খুনো চেঁচিয়ে উঠে ঠিক করলে পালাবে মাশার সঙ্গে।

(১৩) হঠাৎ কোত্থেকে [illegible] বাহরাম। বললে 'ছুটি দে[illegible] ছি। এক্ষুনি তোদের পা[illegible] দেব। শুধু যাদু-কিতাবে খুঁজে দেখি... কিন্তু গুহায় অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, তুই পড়ে শোনা।' মাশা বাহরা[illegible] মুখে খুলো তাড়াতাড়ি যাদুমন্ত্র[illegible] বললে 'বেশ নাকিকা!' তার মানে পাঁচ মিনিট। পাথর হয়ে গেল বাহরাম। জিল-জিলিয়া বললে 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও বেঁচে উঠবে, চলো পালাই।'

(১৪) পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের পাশ দিয়ে গেল আগুনে সাপ। 'এটা বাহরামের যাদু কুণ্ডলী, পাঠিয়েছে আমাদের পেছনে। চলো তাড়াতাড়ি!' হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে মাশা, 'কিন্তু জানো, বাহরাম দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমরা চলে যাব আর এই মিছিমিছি পাতালে ও থাকবে একা। ওকে বোঝানো দরকার যেন আমাদের সঙ্গেই আসে।'

(১৫) 'পালালে সবাই', ক্ষুন্ন মনে বললে বাহরাম, 'ভাবছ রোদ পোয়া-তে, মাঠে বেড়াতে আমার ইচ্ছে নেই? কিন্তু এখানেই আমার সব সম্পত্তি, ওপরে কেউ আমায় পুছবে না।' মাশা বললে 'না, বাহরাম দাদু, লোকের কাছে তোমার দরকার আছে। মাটির নিচেকার ব্যাপার-স্যাপার সবই তুমি জানো। তুমি হবে ভূগর্ভবিদ্যার ডক্টর।' 'ঠিক আছে,' নিশ্বাস ফেললে বাহরাম, 'শুধু গরুটা নিয়ে যাব সঙ্গে করে।'

(১৬) গহ্বর থেকে প্রথম উঠল মাশা, তারপর বাহরাম, তারও পরে জিল-জিলিয়া। গরুকে টেনে তুলতে লাগল দুজনে, কিন্তু ম্লেনের ঝাঁঝরি দিয়ে সে গলছিল না। মাশা বলে উঠল, 'ঠিক আছে, প্রকৃতিবিদ্যা পাঠ্য পুস্তকে ওকে ফেরিয়ে দেওয়া দরকার।' বই বার করলে মাশা, মন্ত্র পড়লে বাহরাম, গরুও অমনি ঠাঁই নিল ছবিতে।

(১৭) ঘণ্টা পড়তেই ইশকুল থেকে ছুটে বেরুল ছেলে মেয়েরা। অবাক হয়ে গেল বাহরাম, 'এতগুলি! সবাই নিশ্চয় মাশার মতোই বুদ্ধি-মান। এবার আমি বুঝেছি কাকে দিয়ে যাব আমার সম্পত্তি। দেব এইসব ছেলেমেয়েদের।

(১৮) এইখানেই ফুরুল আমার বুদ্ধিমতী মাশা, বুড়ো যাদুকর বাহরাম আর ভালোমানুষ খুনো জিল-জিলিয়ার কথা।

পরমাশ্চর্য পেষাই-কল 'সাম্পো'

বহুযুগ আগে আমাদের উত্তরাঞ্চলে, কারেলিয়ায়, লোকেদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল রোমন্থরের দেশ কালেভালা নিয়ে অপরূপ সব কিংবদন্তী। কালেভালার বীরদের আশ্চর্য কিছু কাহিনী আজো পর্যন্ত টিকে আছে। তার একটি নিয়ে বেরিয়েছে 'ডায়াফিল্ম স্টুডিও'র নতুন ফিল্ম-স্ট্রিপ। ছবি এঁকেছেন ভাসিলি ইগ্নাতভ।

১) কালেভালার প্রথম বীর হল জ্ঞানবৃদ্ধ ভিয়াইনেমেইনেন। জীবজন্তু, শিলাপাথর তার কথার বশ। আর যখন গান গাইত সে, সোনালী সূর্য ও রূপোলী চাঁদ তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত শুনতে।

২) কালেভালার আরেক বীর — কামার ইলমারিনেন। অমন নিপুণ কামার কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। গ্রহনক্ষত্র সমেত সে আকাশটাকে বানায় এমন সুন্দর যে, কোনো খাঁজ-খোঁচা, সাঁড়াশীর দাগ কিছুই চোখে পড়বে না।

৩) তৃতীয় বীরও কম যায় না — ফুর্তিবাজ শিকারী লেম্মিনকাইনেন। সবচেয়ে ছুটন্ত হরিণও তার সঙ্গে দৌড়ে পারে না। সবচেয়ে দুরন্ত ঘোড়াও তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে পারে না। তাকে দেখে গরগরে ভালুক পিছিয়ে যায়, আগুনে ঈগল শান্ত হয়।

৪) সুখের দেশ ছিল সেটা। মাটিকে যেন মধু খাওয়াত বৃষ্টি, গমের মঞ্জরি ভরে উঠত সোনালী দানায়, চিরকাল সবুজ হয়ে থাকত বন-উপবন, নদীতে ছিল অঢেল মাছ।

৫) আর কালেভালার পাশেই ছিল ঠাণ্ডা, অন্ধকার এক দেশ পাহিওলা। সেখানে তুষারঢাকা খেতে লাফায় তুষারের খরগোস, তুষারঢাকা নদীতে ডুব দেয় তুষারের হাঁস, জমাট হয়ে যাওয়া জলপ্রপাতের ওপর ওড়ে তুষারের হংস-বলাকা।

৬) পাহিওলার কর্ত্রী, কুচুটে বুড়ি লৌহি শুনেছে কালেভালার কথা, হিংসেয় বুক তার জ্বলে গেল। তক্কে তক্কে থেকে ইলমারিনেনকে ধরল। বলে, 'শোনো বীর, যদি চাও তো আমার সুন্দরী মেয়েকে তোমায় দেব।'

৭) 'বেশ তো,' খুশি হয়ে উঠল ইলমারিনেন। লৌহি কিন্তু বলে, 'তার বদলে আমায় সাম্পো পেষাই-কল বানিয়ে দিতে হবে। যদি ইচ্ছে করি ময়দা পিষবে, যদি চাই নুন গুঁড়োবে, যদি বলি — সোনা।'

৮) ইলমারিনেন বাতাসকে ডাকল হাপরে আগুন জ্বালাতে। বাতাস ফুঁসল তিন দিন, তিন রাত। আর দিন-রাত হাতুড়ি পিটে গেল সে। তারপর আগুন থেকে উঠে এল পরমাশ্চর্য পেষাই-কল সাম্পো।

৯) সাম্পো নিয়ে লৌহি তাকে লুকিয়ে রাখল গুহার গভীরে। তার মেয়ে পাহিওলার সুন্দরী ইলমারিনেনের কাছে গিয়ে বলে, 'ঝুলমাখা, কালিমাখা, তোমায় আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।'

১০) তিন মাস ধরে হা-হুতাশ করে ইলমারিনেন, কেবলি মনে পড়ে সুন্দরীর কথা। তাকে সান্ত্বনা দিলে জ্ঞানী ভিয়াইনেমেইনেন, 'দুঃখ কোরো না বন্ধু, মনের মতো বউ আরো পাবে। কিন্তু কুচুটে লৌহির কাছ থেকে ওই সাম্পো আমরা নিয়ে আসব। ভালো লোকদের সুখ-সৌভাগ্য দিক।'

১১) জলে তারা নৌকো ভাসাল। ভিয়াইনেমেইনেন হাল ধরল, ইলমারিনেন আর লেম্মিনকাইনেন বাইল দাঁড়, নাও চলল নীল সাগর-ঢেউয়ের ওপর দিয়ে। বীরেরা এল আঁধার গুহা থেকে সাম্পোকে উদ্ধার করতে।

১২) পাহিওলার কর্ত্রী শুধোয়, 'কেন এলে বলো তো বীরেরা?' ভিয়াইনেমেইনেন বলে, 'সাম্পোর জন্যে। রোদ্দুরে যাদের আনন্দ, তাদের ওতে উপকার হোক। ভালোয় ভালোয় না দিলে কেড়ে নেব।'

১৩) নিজের লোকজনদের ডাকল লৌহি। পাহিওলার হিংস্র ছেলেরা ঘিরে ধরল ভিয়াইনেমেইনেনকে। কিন্তু গাছের গুঁড়ির ওপর বসে মুচকি হেসে গান ধরল জ্ঞানী ভিয়াইনেমেইনেন — অমনি, সব হিংসা তাদের যেন বাতাসে উড়ে গেল।

১৪) কেঁপে উঠল ভারি ভারি হুড়কো, খুলে উঠল আঁধার গুহার লোহার দরজাগুলো। হঠাৎ একসঙ্গে খুলে গেল তার নয় দরজার সবকটা। কালেভালার তিন বীর পরমাশ্চর্য পেষাই-কল নিয়ে চলে গেল তাদের নৌকোয়।

১৫) ভয়ঙ্কর একটা পাখি হয়ে লৌহি তাদের পিছু নিল, নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরল সাম্পোকে, কিন্তু সামলাতে পারল না। পেষাই-কল সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ঢেউয়ের তোড়ে গেল ভেঙে। হিংসুক লৌহির তাতে ভারি আনন্দ — কালেভালার লোকেরা তো আর সাম্পো পাবে না।

১৬) তবে পরমাশ্চর্য পেষাই-কল হারিয়ে যায় নি। ঢেউ তার টুকরোগুলোকে এনে ফেলে কালেভালার তীরে। আর ভিয়াইনেমেইনেন যত্ন করে তা কুড়িয়ে পুঁতে রাখে মাটিতে। 'জন্মভূমিতে সুখ-সমৃদ্ধি আনুক। দূরে রাখুক আলাই-বালাই থেকে।'

হাঁসেরা একের পেছু এক ওড়ে কেন?

১) ঘটেছিল কি ঘটে নি, জানা নেই, তবে এক-যে ছিল চাষী। ঠিক করলে হ্রদের তীরে মটর বুনবে।

২) কপাল খারাপ, বুনো হাঁসেরা উড়ে এল তার মটর খেতে। কী করে, ওদের হাত থেকে রেহাই মেলে কিভাবে?

৩) ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি খাটালে। মধু আর বিয়ার কিনে তা মিশিয়ে বারকোষে করে রেখে দিল মটরের মাঝখানে।

৪) সকালে হ্রদে উড়ে এল মস্তো এক ঝাঁক হাঁস। মটর আর পানীয় খেয়ে মাতাল হয়ে উঠল।

৫) ঢলে পড়ল সব মাটিতে। চাষীর আনন্দ ধরে না, ভাবে, এইবার হাঁসের মাংসে পেট ভরাব।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

কী, কেন, কোত্থেকে—এ রকম অজস্র প্রশ্ন করে শিশুরা আর বড়োরা তার সঠিক উত্তর দিতে না পারলে সাধারণত গল্প বানায়। তাতে বাস্তবতা বা বৈজ্ঞানিকতার কোনো দাবি থাকে না, ঘটেছিল কি ঘটে নি, সেটা কোনো কথাই নয়, শুধু গল্পটা যেন হয় মন-কাড়া, শিক্ষাপ্রদ। যেমন, হাঁসেরা কেন একের পর এক সারি দিয়ে ওড়ে, তার এই জবাব দিয়েছে একটি লাতভীয় কাহিনী।

৬) হাঁসগুলোকে পর পর লেজের পেছনে ঠোঁট ঠেকিয়ে সে বাঁধলে একটা দড়ি দিয়ে, দড়ির খোলা প্রান্তটা জড়াল বেল্টের সঙ্গে।

৭) তারপর হাঁসগুলোকে যেই কাটতে যাবে, অমনি তারা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডাক ছেড়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল আকাশে।

৮) সঙ্গে সঙ্গে দড়ি-বাঁধা চাষীও চলল ভেসে। লাফিয়ে পড়তে ভয় লাগে তার। শেষে নিচে একটা জলা দেখে দড়িটা কেটে ফেলল।

৯) তিন দিন পর জলা থেকে উদ্ধার পেল সে, বাড়ি ফিরল আধমরা হয়ে। বৌ, ছেলে-পুলেদের কী আনন্দ তখন।

১০) আর সেই থেকে হাঁসেরা ওড়ে একের পর এক সারি দিয়ে, যেন একটা দড়ি দিয়ে কেউ তাদের বেঁধে দিয়েছে।

সৃজনের যন্ত্রণা আর বোকাবুকির আনন্দ যে কী, সেটা 'ফ্লোরিচিকার' ছেলেমেয়েরা জানে। ফিল্ম রচনার সমস্ত রহস্য জানার সুযোগ আছে তাদের আর শেষাবধি নিজেদের শ্রমে বয়স্কজনোচিত পরিতৃপ্তির পথ খুলে যায় তাদের সামনে।

খাঁচায় সারস-ছানা

'ফ্লোরিচিকা' স্টুডিওর কাজের পরিচয় নিন পাঠকেরা। এতে অংশ নিয়েছেন আলেনা চেবোতার, ইরেনা অসিপভা, এলিনা বলগারিনা, ভ্যালেন বারবে, ইরিনা সুবনেভস্কায়া

১) মোলদাভিয়ায় এল লাইলাক ফুলের উষ্ণ বসন্ত। লম্বা শীতকালে বোনা গালিচা টাঙিয়ে রাখল মেয়েরা। কী আর চাই?

২) বসন্তের জন্যে তৈরি হতে বড়োদের সাহায্য করে ছোটোরা। গাছপালার গুঁড়ি তারা শাদা রঙে রাঙায়, এটা তাদের কাজ।

৩) সজ্জনেরা পাখি উড়ে আসার পথ চেয়ে থাকে, বানায় সারস ছানার জন্যে বাসা।

৪) সারসদের প্রথম দেখে শিশুরা। বলে 'নমস্কার' বিনেয়াৎস ভেনিৎ!' — মোলদাভীয় ভাষায় তার মানে স্বাগতম্।'

৫) গ্রামে নামল সারসেরা, শুরু হল বসন্ত। আর শিগগিরই লোকজন, পাখ-পাখালির মনে আনন্দ: প্রতিটি বাসাতেই হলদেটে ছানা।

৬) শুধু একটা বাসার ওপর মন ভার করে ঘুরছিল একজোড়া পাখি। বাসাটা তাদের শূন্য, ঠোঁট বার করে সারস-ছানা নেই সেখানে।

৭) ছেলেমেয়েদের মায়া হল ওদের জন্যে। বুড়ো বাবলা গাছটার কিছু দূরে তারা কীসব ঠুক-ঠাক করতে বসল।

৮) আর কাজটা যখন শেষ হল, সবাই দেখল ছোট লেন্‌ৎসার হাতে একটা সারস-ছানা, সেটা বানানো হয়েছে আঙুর গাছের কাঠি দিয়ে, পাখাগুলো স্কুলের খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া।

৯) আর অল্পক্ষণের জন্যে ঘর ছেড়ে যাওয়া সারসদের অপেক্ষায় থেকে লেন্‌ৎসা সন্তর্পণে রাখল তার কাগুজে শাবকটিকে।

১০) অন্যান্য সারস-শাবক ইতিমধ্যে উড়তে শিখেছে। কাগুজে ছানাটিকে মা সন্তর্পণে বাসা থেকে ঠেলে দিত, কিন্তু সে পড়ত একেবারে মাটিতে।

১১) কিন্তু ছোটো ছোটো সহৃদয় হাত সর্বদাই ওটি ধরে ফেলে আবার উড়িয়ে দিত আকাশে।

১২) সারস-ছানা রইল খাঁচায়, ডানা মেলে সে আগলে থাকতে মা-বাপেদের। ছেলেমেয়েরা তাকে দিত লজেন্স, মিষ্টিরুটি।

১৩) যখন টিলাগুলোর চূড়ায় নামল হৈমন্তী কুয়াশা, তখন বাসা ছেড়ে যাবার সময় হল সারসদের।

১৪) বিষন্ন মনে তাদের উড়াল দেখল ছেলেমেয়েরা: তাদের ঠিক মাঝখানে, মা-বাপের পক্ষপুটে যে উড়ে যাচ্ছে তাদেরই বানানো কাগজের সারস-ছানা।

১৫) লেন্‌ৎসা চেঁচিয়ে উঠল: 'ফিরে আসিস বসন্তে!'

১৬) আর হঠাৎ, স্কুলের খাতার রুল-টানা পাতায় বানানো পাখা নেড়ে সারস-ছানা কী যেন বললে সারসী ভাষায়। লেন্‌ৎসার কানে এল: 'অপেক্ষায় থেকো আমাদের!'

নদীর মাছ কেন কথা কয় না

'ডায়াফিল্ম' স্টুডিওর নতুন কাহিনী। রচনা করেছেন লেখিকা স. প্রকোফিয়েভা এবং শিল্পী ম. জেরেবচেভস্কি।

একদিন খুকুমণি মাশা ঠিক করলে দিদিমার বাড়ি বেড়াতে যাবে। দিদিমা থাকেন নদীর অপর পারে গাঁয়ে।

নদীর ঘাটে এল মাশা। মস্ত গভীর নদী। নৌকায় চাপল, দাঁড় টেনে নিলে, কিন্তু বাইতে পারে না, অতটা জোর নেই।

তারপর মাছেরা গিয়ে ধরলে ব্যাঙদের, 'মাশাকে এটা পেঁৗছে দাও।'—'ঠিক আছে,' ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে উঠল ব্যাঙেরা।

বনের মধ্যে লাফিয়ে চলছে ব্যাঙেরা, সামনে সব খরগোসছানা। ছানারা কেঁদে বললে, 'কী করি বলো তো, খেঁকুরে শেয়াল পেছু নিয়েছে, হাঁপিয়ে গেছি আমরা।'

'দেখি তো সব খরগোসছানা, হাঁ করো তো বেশ বড়ো করে,' এই বলে পুরো এক এক চামচে তেল দিলে ব্যাঙেরা।

এবার মাশার বাড়ি। দরজায় সামনে বসে ব্যাঙেরা ডাক জুড়ল ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাশা। 'ডাক জুড়েছিস কেন?'—'আমরা তোর জন্যে মাছের তেল এনেছি,' বললে ব্যাঙেরা, 'এটা তোর জন্যে উপহার পাঠিয়েছে মাছেরা।'

অমনি ঝোপ থেকে বেরল খরগোসছানা, ডাল থেকে কাঠবেড়ালি। সবাই বললে, 'খা মাশা, খা।' মাশাও তাদের কথা শুনে খেলে। হয়ে উঠল শক্তসমর্থ।

মনের দুঃখে বাড়ি চলল মাশা। দেখে মায়া হল মাছেদের। ভাবতে বসল কী করে মাশাকে সাহায্য করবে।

নদীতে ছিল এক বুড়ো জ্ঞানী কাতলা। ভেবে ভেবে সে বললে, 'মাশার উচিত মাছের তেল খাওয়া। তাহলে জোর বাড়বে।'

বোতলে মাছের তেল জমালে সবাই। যে পারলে দিলে — চুনোরা এক ফোঁটা, বড়োরা পুরো এক চামচে।

সঙ্গে সঙ্গে খরগোসছানাদের জোর বাড়ল। এক ছুটে পালিয়ে গেল খেঁকুরে শেয়ালের কাছ থেকে।

লাফিয়ে চলেছে ব্যাঙেরা, সামনে কাঠবেড়ালি বাদামের বস্তা বইছে। হাঁপিয়ে গেছে কাঠবেড়ালি, এক পা যায় আর থামে।

কাঠবেড়ালিকেও মাছের তেল খাওয়ালে ব্যাঙেরা। সঙ্গে সঙ্গেই তার জোর বাড়ল, বস্তা নিয়ে সটান উঠে গেল গাছের ডগায়।

নদীর ঘাটে এল মাশা, উঠে বসল নৌকায়, পাড়ি দিয়ে গেল ওপারে।

ভারি খুশি হলেন দিদিমা। মস্তো এক প্যাকেট লজেন্স দিলেন মাশাকে।

ছুটে নদীর কাছে এসে মাশা সমস্ত লজেন্স ছুড়ে দিলে নদীতে। 'ও মাছেরা, এটা তোদের জন্যে।' চুপচাপ হয়ে গেল নদী, সাঁতরে বেড়ায় মাছ, প্রত্যেকের মুখে একটি করে লজেন্স।

এবার বুঝলে তো, নদীর মাছ কেন কথা কয় না। কথা কইবে কী করে, মুখ যে মাশার দেওয়া লজেন্সে বন্ধ।

ক. পাউস্তোভস্কির কাহিনী অবলম্বনে ছোটোদের জন্যে একটি ফিল্ম স্ট্রিপ। ছবি এঁকেছেন শিল্পী ইয়ে. মেশকোভ।

তপ্ত রুটি

১) ঘোড়সওয়ার বাহিনী যখন গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন শত্রুর গোলায় জখম হয় একটি কালো ঘোড়া। সেনাপতি ঘোড়াটিকে গাঁয়ে রেখে এগিয়ে যান বাহিনী নিয়ে।... ঘোড়াটাকে নেয় ময়দাকলের পানক্রাৎ। সেরে উঠে ঘোড়াটা ময়দাকলেই রয়ে গেল, মাটি, সার, জাঁ বইত, সাহায্য করত বাঁধ মেরামতিতে।

২) গাঁয়ের লোকে বলত ঘোড়া সাধারণের সম্পত্তি, তাই তাকে খাওয়ানো সবাই নিজেদের কর্তব্য বলে গণ্য করত। ঘোড়াটা গিয়ে দাঁড়াত ফটকের কাছে, ঘোঁতঘোঁত করত, মুখ ঠুকত বেড়ায়, দেখতে না দেখতে লোকে এনে দিত দানা, এমনকি মিষ্টি গাজরও।

৩) সে বছর শীতটা ছিল গরম, ময়দাকলের কাছে জল না জমে চুপচাপ কালো হয়ে পড়ে রইল। তেমনি একটা গরম স্যাঁতসেঁতে দিনে জখমী ঘোড়াটা যে বাড়ির বেড়ায় মুখ ঠুকল, সেখানে ঠাকুমার সঙ্গে থাকত ফিলকা নামে একটি ছেলে। ছেলেটা ছিল চুপচাপ, সন্দেহপ্রবণ, তার পেয়ারের বুলি ছিল: 'পালা না বাপু!'

৪) ফিলকা বসে বসে এক টুকরো রুটি চিবোচ্ছিল। শব্দ শুনে অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে এল বেড়ার বাইরে। ঘোড়াটা এ-পা ও-পা করে মুখ বাড়াল রুটির দিকে। 'পালা না বাপু!' ফিলকা চেঁচিয়ে উঠে, ঘোড়ার মুখে বাড়ি মারল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। তারপর রুটিটা ছুড়ে ফেলল দূরে কুরকুরে বরফের মধ্যে। 'তোর আর মন ওঠে না! ঐ যে তোর রুটি! খোঁড় গিয়ে!'

৫) এই হিংসুটে [illegible] পর আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটল গাঁয়ে। ঘোড়ার চোখ ভরে উঠল জলে। করুণ একটানা ডাক ছেড়ে সে ঝাপটা মারল লেজ দিয়ে, অমনি ন্যাড়া ন্যাড়া গাছপালোর মধ্যে, বেড়ায় আর চুল্লির চিমনিতে শনশনিয়ে উঠল ধারালো বাতাস, তুষার ঝড় বইতে লাগল। ফিলকা ছুটে গেল বাড়ির দিকে...

৬) ...কিন্তু অলিন্দটা খুঁজে পেল কোনোক্রমে — চারদিকে তুষার ঝড়। শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ফিলকা। সন্ধ্যার দিকে ঝড় থামল। আর রাতে আকাশ হয়ে উঠল বরফের মতো সবুজ, জমে গেল তারারা, আর কাটিফোটানো শীত নামল গাঁয়ে।

৭) ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে ফিলকাকে বললে যে কুয়ো নিশ্চয় জমে গেছে, এবার মরণ, কোনো উপায় নেই। নেইকো জল, সবার ময়দা ফুরিয়ে গেছে, ময়দাকল এখন আর চলবে না — নদী একেবারে তলা পর্যন্ত জমে গেছে। 'এমন ঠাণ্ডা এল কোত্থেকে?' 'লোকের কুকীর্তি থেকে। তার সাথে গাঁয়ে খারাপ লোক দেখা দিয়েছে, অন্যকে অপমান করে, খারাপ কাজ করেছে, সেইজন্যেই এত শীত।'

৮) 'তাহলে কী করি ঠাকুমা? শীতেই মরতে হবে?' 'মরতে হবে কেন? আশা রাখ। দরকারে সে খারাপ লোকটা তার অন্যায় শোধরাবে।' 'কী করে শোধরানো যায়?' 'সেটা আর ময়দাকলের পানক্রাৎ। লোকটা বুদ্ধিমান, বিদ্যেও আছে।' রাতে ফিলকা তার চুল্লির তাক থেকে নেমে মেষচর্মের কোটটি গায়ে চাপিয়ে ছুটল পানক্রাতের কাছে।

৯) মনে হল যেন বাতাসও জমে গেছে, চাঁদ আর মাটির মাঝখানটা সবই শূন্য। কলের বাঁধের কাছে কালো কালো উইলো গাছগুলো শাদা হয়ে গেছে হিমে। জানলায় টোকা দিল ফিলকা। অমনি বাড়ির পেছনে আস্তাবল থেকে ডাক ছেড়ে মাটিতে পা ঠুকল জখমী ঘোড়াটা। আঁৎকে উঠল ফিলকা...

১০) 'চুল্লির কাছে বোস, জমে যাওয়ার আগে বরং বল কী হয়েছিল।' কাঁদতে কাঁদতে ফিলকা পানক্রাৎকে সব বললে। 'এখন আমি কী করি পানক্রাৎ দাদু?' 'শীত থেকে বাঁচার উপায় বের কর। তাহলে লোকের কাছে তোর দোষ কেটে যাবে। জখমী ঘোড়ার কাছেও। সৎ, হাসিখুশি হবি।'

১১) 'ভোর হতেই আমি গাঁয়ের সমস্ত ছেলেদের জোটাব। চাকায় জল না এসে পড়া পর্যন্ত বরফ খুঁড়ে যাব খন্তা, শাবল, কুড়ুল নিয়ে।' 'তা বেশ, লেগে যা, জোটা ছেলেদের, আমি কথা কইব বুড়োদের সঙ্গে।'

১২) সেদিন সকালে আকাশে উঠল সিঁদুরে সূর্য। নদীতে শোনা যাচ্ছিল বরফ ভাঙার ঘনঘন শব্দ। ফটফট করে জ্বলছিল ধুনি। ছেলেরা আর বুড়োরা খাটল একেবারে সকাল থেকে! উত্তেজনায় কেউ খেয়াল করে নি যে দুপুরে নিচু মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, শাদা উইলোগুলোর মধ্যে দিয়ে বইছে শান্ত, উষ্ণ হাওয়া।

১৩) সন্ধ্যার দিকে বরফ কেটে দিয়ে সরে গেল, ছেলে-বুড়োরা কাজ চালিয়েই গেল, সশব্দে জল এসে পড়ল খাতে। কাঁচকাঁচ করে ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল পুরনো চাকাটা।

১৪) ঠকঠক করে উঠল জাঁতা, পুরনো ময়দাকলটা কেঁপে কেঁপে খটখটিয়ে কাঁচকোঁচিয়ে চলাতে শুরু হল পেষাই। পানক্রাৎ দানা দিচ্ছিল আর জাঁতার তল থেকে তপ্ত ময়দা এসে পড়ছিল বস্তায়। তার মধ্যে মেয়েরা জমে যাওয়া হাত গুঁজে হাসতে লাগল।

১৫) কুটিরগুলো আলো হয়ে উঠল তপ্ত চুল্লির আগুনে। ময়দা মাখতে লাগল মেয়েরা, আটোসাঁটো, মিষ্টি। আর কুটির জীবন্ত যা কিছু ছিল — ছেলেপিলে, বেড়াল, এমনকি ইঁদুরেরাও সকলে ঘুরঘুর করতে শুরু করলে গিন্নিদের কাছে।

১৬) রাতে সারা গাঁয়ে গালচে চটার রুটির এমন গন্ধ ছাড়ল যে শেয়ালরা পর্যন্ত গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বরফের ওপর বসে কাঁপতে কাঁপতে সামনা দাঁত কেলাল আর ভাবতে লাগল কী করে অপূর্ব এই রুটির একটি টুকরো মেরে দেবে।

১৭) পরের দিন সকালে ছেলেপিলেদের সঙ্গে ফিলকা গেল ময়দাকলে। টাটকা সেঁকা রুটি তার হাতে। পানক্রাৎ আস্তাবলের দরজা খুলে ঘোড়াকে বার করে আনলে। গলা বাড়িয়ে ঘোড়া ডাক ছেড়ে উঠল, টাটকা রুটির গন্ধ পেয়েছিল সে। ফিলকা রুটি ভেঙে খানিকটা নুন মাখিয়ে এগিয়ে দিল ঘোড়ার দিকে।

১৮) ঘোড়া মাথা নাড়ল, কী ভাবল, তারপর সন্তর্পণে গলা বাড়িয়ে নরম ঠোঁট দিয়ে রুটি নিল ফিলকার হাত থেকে। এক টুকরো খেয়ে শুঁকে দেখল ফিলকাকে, তারপর দ্বিতীয় টুকরোটাও নিল। সবটা খাওয়ার পর ফিলকার কাঁধে মাথা নামিয়ে ফুঁপিয়ে চোখ বুজে নিঃশ্বাস ফেললে।

১) সে অনেক আগের ঘটনা। তখন এখানে ছিল বন, ঢোকা যায় না, বেরনো যায় না। সেখানে যেত শুধু তারাই, যারা জন্তু-জানোয়ার শিকার করত। শোনা যায়, বাশকির এলাকায় থাকত আইলিপ নামে এক শিকারী। তার মতো দুঃসাহসী আর কেউ ছিল না।

২) একদিন আইলিপ তার ঘোড়ায় চেপে ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, দ্যাখে, শেয়াল। ঘোড়া ছুটোল আইলিপ, কিন্তু শেয়ালকে আর ধরতে পারে না। ঘোড়া থেকে নেমে সে পায়ে হে'টেই ছুটল শেয়ালের পেছনে। কিন্তু ফল হল না কিছু, গিয়ে পড়ল একেবারেই অচেনা এক জায়গায়।

৩) 'অন্তত দেখা যাক কোথায় আছি?' এই ভেবে উঠল সে এক ঝাঁকড়া গাছে। দ্যাখে—কাছেই একটা নদী, পাথরের ওপর বসে আছে একটি মেয়ে, কী তার রূপ! ঘাড় থেকে বেণী ঘুরিয়ে ফেলতেই ডগাটা পে'ছিল জলে। আর বেণী কিন্তু তার সোনার।

৪) মাথা তুলে মেয়েটি বললে: 'কুশল হোক, আইলিপ। শেয়াল মাসির কাছে তোমার কথা শুনেছি অনেক আগেই। বিয়ে করবে আমায়?' আইলপের আর আনন্দ ধরে না: 'এই যখন তোমার ইচ্ছে, আমি আর কী বলব। কোলে করে নিয়ে যাব, কাউকে দেব না।'
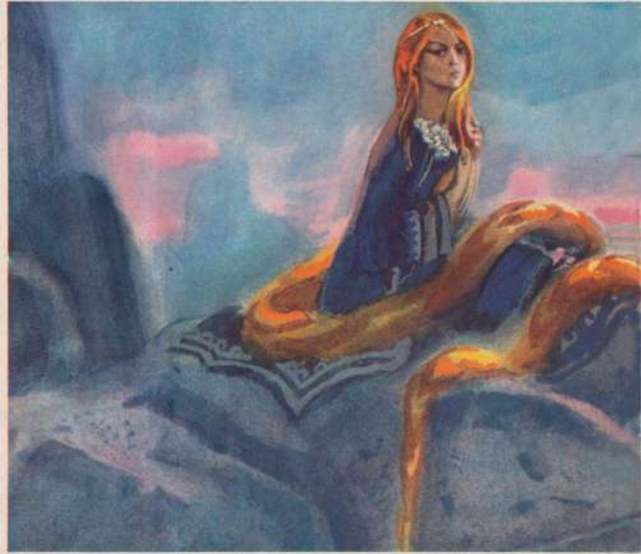
৫) এই সময় পায়ের নিচে চে'চিয়ে উঠল শেয়াল, দেখা দিল একটা থুত্থুড়ে বুড়ি: 'এ হল পৃথিবীর সমস্ত সোনার অধীশ্বর মহানাগের মেয়ে, নাম স্বর্ণকেশিনী। চুল ওর নিখাদ সোনা। আগে বেণীটাই তুলে দ্যাখো, টের পাবে কোলে করার ক্ষমতা ধরো কিনা।'

৬) বেণী টেনে তুলে আইলিপ নিজের গায়ে তা জড়াতে লাগল। কনে ওদিকে তাড়া দেয়: 'চলো এখান থেকে যতদূর পারা যায় পালানো যাক। আমার বাবার এত শক্তি যে সমস্ত সোনা মাটির ভেতর টেনে নিতে পারে। আমার চুল নেবার যদি ইচ্ছে হয়, কারো তা ঠেকাবার সাধ্য নেই।'

৭) আইলিপ বললে: 'সে দেখা যাবে।' এই বলে মেয়েটির হাত ধরে চলতে লাগল। বুড়ি তাকে একটা কাঁচি দিয়ে বললে: 'অন্তত এটা নাও, কাজে লাগবে।' যেতে যেতে যেতে হাঁপিয়ে পড়ল। আইলিপ বললে: 'একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।' আর ঘাসের ওপর বসতেই...

৮) ...তাদের টানতে লাগল মাটির নিচে। আইলিপের গায়ে যে বেণী জড়ানো ছিল, চট করে সেটা কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে স্বর্ণকেশিনী। সমস্ত চুল চলে গেল মাটির তলে, ওপরে আইলিপ রইল একা। ভাবে: 'প্রাণ যায় তাও স্বীকার খু'জে ওকে বার করবই।'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

স্বর্ণকেশিনী

সোভিয়েত লেখক পাভেল বাজোভ সংকলিত উরাল কিংবদন্তী 'মালাকাইটের ঝাঁপি' থেকে কাহিনীটি নেওয়া। উরালের রুদ্র-মনোহর প্রকৃতি, ভূমির অসীম সম্পদ,—বহুকাল থেকে লোকে এখানে মণিরত্ন, সোনা আহরণ করছে—এতে গড়ে উঠেছে নানারকম কিংবদন্তী। বাজোভের কাহিনীগুলি তারই অনুসরণে। নায়কেরা সবাই উরালের লোক—খনিশ্রমিক, শিকারী, পাথর-কাটিয়ে, সেইসঙ্গে প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির প্রতিমূর্তি এক কাল্পনিক সত্তা।

'ডায়াফিল্ম' স্টুডিওর এই ফিল্ম-স্ট্রিপটির জন্যে ছবি এ'কেছেন ভ. বর্গিজলভস্কি।

৯) এই সময় পায়ের নিচে চে'চিয়ে উঠল শেয়াল। নাক গ'জে মাটিতে, বেরিয়ে এল থুথুড়ে বুড়ি হয়ে। 'বাড়ি যাও। তিন বছর কনেকে যদি না-ভুলে যাও, তাহলে ফের তোমার কাছে আসব।'

১০) ওহ্, কী লম্বাই না এই তিন বছর! শেষ বছরটা কাটতেই আইলিপ শেয়ালটাকে দেখলে। গেল সেই নদীতে। কনেকে কুর্নিশ করলে আইলিপ। মেয়েটি বললে: 'আমার চুল যে আরো লম্বা হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ করো না আইলিপ। অনেক হালকা হয়ে গেছে তা। দেখছি, অনেক ভেবেছ আমার কথা।'

১১) জল থেকে বেণী টেনে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে জড়াল আইলিপ, বন দিয়ে চলল বাড়ির দিকে। চলল রাত পর্যন্ত। একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠতে আইলিপ বললে: 'শোনো গাছে ওঠা যাক, ভোর পর্যন্ত সবুর করব। তোমার বাবা হয়ত গাছে আমাদের নাগাল পাবে না।'

১২) সব চুপচাপ। শুধু গাছে ঝটপট করছে এক প্যাঁচা। হঠাৎ ঠিক মাঝরাতে ডালপালাগুলো ফটফট করে জ্বলে উঠল। ঝাঁকা খেয়ে আইলিপ পড়ল মাটিতে। শুধু এইটুকু দেখতে পেল যে মাটিতে এক প্রকাণ্ড আগুনের বেষ্টনী, কনে তার হয়ে গেল সোনালী ফুলকির এক মেঘ।

১৩) প্যাঁচাকে নিজের দুঃখের কথা বললে আইলিপ, সাহায্য চাইলে। প্যাঁচা তাকে এক-এক কথায় বললে, 'ছুটে গিয়ে সায়রগুলো নজর করো। একটার মাঝখানে দেখবে পাহাড়ের মতো একটা পাথর। সোনা নিয়ে এই পাথরটা পর্যন্ত পে'ছিতে পারলে সায়রের নিচের পথ খুলে যাবে। মহানাগ এখানে ধরতে পারবে না।'

১৪) সায়র খু'জতে চলল আইলিপ। পেয়েও গেল। ভাবল, একদিনে এতদূর পর্যন্ত আসা সম্ভব নয়। ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার পথ চাই। শুরু করল পথ বানাতে। এতে অলক্ষ্যে কেটে গেল আরো তিন বছর। শুধু সময়মতো সব তৈরি করে নিতে পেরেছিল।

১৫) ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আইলিপ পে'ছিল তার কনের কাছে, তারা ছুটল বন দিয়ে। ঘোড়া যাবার রাস্তায় আগে থেকেই তৈরি ছিল ছ'টা ঘোড়া। সেখান থেকে সন্ধে নাগাদ পে'ছে গেল সায়রে। সঙ্গে সঙ্গেই ডিঙিতে উঠে বসল আইলিপ, কনেকে নিয়ে এল পাথরটার কাছে।

১৬) গিয়ে পে'ছিতে খুলে গেল পাথরের পথ। তারাও নেমে গেল সেখানে, এই সময় অস্ত গেল সূর্য। তারপর যা কাণ্ড। লোকে বলে, গোটা সায়রকে মহানাগ আগুনের তিন বেষ্টনীতে ঘিরে ফেলে, তাসত্ত্বেও মেয়েকে সে টেনে আনতে পারে নি। শক্তি ছিল না।

কুঁজো টাট্টু

গত সংখ্যায়, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমরা পিওত্র ইয়েরশোভের বিখ্যাত রূপকথা — ইভান আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু ছোট্টো এক কুঁজো টাট্টু ঘোড়ার সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। বলবান, ন্যায়পরায়ণ ও ভালোমানুষ ইভান এবং তার ছোট্টো টাট্টু, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত হলো।

এবারে হলো কি — নতুন একটা আদেশ জারি হলো তাদের উপর: সমুদ্রের অতল জলে সম্রাটদুহিতার যে আংটি হারিয়ে গেছে তা খুঁজে আনতে হবে এবং পথে যেতে যেতে চন্দ্র ও সূর্যকে আর সম্রাটের আদাব জানাতে হবে।

আমাদের এই দুই বীর — ইভান ও তার টাট্টু — তো সমুদ্রের ধারে এলো, তারপর দেখলো কি...

রয়েছে শুয়ে আড়াআড়ি
তিমি মাছ সে বিশাল ভারি।
গর্ত ভরা দু'পাশ তার,
ভিতরে ঢোকা পাঁজর হাড়।

ইভান আর টাট্টু যে অভিযানে বেরুচ্ছে তিমি সে খবর শুনে ফেলেছিল। এই দণ্ডভোগ অসহ্য হচ্ছে বলে সে ওদের দু'জনকে বললো, ওরা যেন তার জন্যে সূর্যের কাছে তার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

ইভান কেমন করে চন্দ্র ও সূর্যের দেশে পাড়ি জমালো তা তোমরা নিজেই পড়ে দেখ না। এ সংখ্যায় আমাদের গল্প শুরু হচ্ছে চন্দ্র-সূর্যের দেশ থেকে তাদের ফিরে আসার পরে, সমুদ্রের তীরে যখন তারা দাঁড়িয়ে তখন।

১) টাট্টু গাঁয়ে ছুটলো বেগে,
গ্রামবাসীদের বললো ডেকে:
— এখান থেকে সবাই পালা,
নইলে এবার আসছে খেলা,
উথালপাথাল সমুদ্র যাক
তিমি মাছটা ফিরবে পাশ...

২) তখন — গরিব ধনী সব চাষীরা
ভালোমানুষ খৃষ্টানেরা
করলো জড়ো জুড়িগাড়ি,
তার ওপরে তড়িঘড়ি
যা কিছু সব বোঝাই ক'রে
তিমির ভয়ে পালায় ওরে।

৩) টাট্টু হাঁকে গলা ফাটিয়ে:
— ও ভাই তিমি, শুনছো হে!
গিলেছ তুমি সাগরমাঝে
এক কুড়ি দশ জাহাজ যে;
ছাড়লে পরে তাদের তুমি
চলে যাবে রোগ বালামী।

৪) বিশাল তিমি কাঁপিয়ে গা
নড়লো যেন মস্তো টিলা
সাগরজলে তুফান তুলে
উগরে দিলো চোয়াল ঠেলে
তিরিশ জাহাজ একেক করে
মাঝিমাল্লা পালটি সমেত।

৫) সাগর ফোঁসে ঘূর্ণিবাতে,
জাহাজ দূরে যায় মিলায়ে।
বিশাল তিমি তুললো শোর,
গলা ফাটিয়ে চেঁচায় জোর:
— বন্ধু আমার, এখন জানাও
কী দেবো বা, কী বর চাও।

৬) ইভান তাকে জানায় তবে:
— আংটি খুঁজে আনতে হবে।
— আনবো খুঁজে বিজলী-মার
লাল আংটি জার তনয়ার —
বলেই তিমি মারলো ডুব
অতল জলে ডুবলো টুপ।

ইভান জার-তনয়ার আংটি এনে দিলে রাজপ্রাসাদে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হলো। কিন্তু বিয়ে যার সাথে সে তো দেখতে কুচ্ছিৎ এক বুড়ো রাজা, সুন্দরী জার-তনয়ার মোটেই তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। বুড়ো রাজা যাতে তরুণ হয়ে ওঠে সেজন্যে জার-তনয়া তাকে তিনটে বিভিন্ন ধরনের কড়াইয়ে স্নান করতে পরামর্শ দিলো: প্রথম কড়াইয়ে বরফ-ঠাণ্ডা জল, দ্বিতীয়টিতে গরম পানি, আর তৃতীয়টিতে থাকবে ফুটন্ত দুধ। কথাটা শুনেই পছন্দ হলো রাজের। কিন্তু এই জাদুকরী দাওয়াই নিজে ব্যবহার করার আগে তিনি ইভানকে বললেন পরীক্ষা করে দেখতে, এবং ইভান যদি রাজী না হয় তাহলে জল্লাদের হাতে মাথা কাটা যাবে তার...

'কি সাংঘাতিক! ঠিক আছে ভাই,
মোর দোস্তি এতেও চাই...'

কুঁজো টাট্টু বললো ইভানকে। তারপর সে ইভানকে পরামর্শ দিলো কী কী করতে হবে।

৭) পরের দিন ভোর সকালে
ইভানকে সে জাগিয়ে তোলে:
মাথা চুলকে ইভান জাগে
হাইটি তুলে বিছান ছাড়ে,
সাঙ্গ করে প্রার্থনা সে
উঠোন পানে চললো হে'টে।

৮) ফুটছে কড়াই এক সারেতে
চুপটি বসে তার পাশেতে
সইস আর রসুইকার
আরো আছে পাহারাদার
ঠেলছে কাঠ উনুনে জ্বলে,
ইভান নিয়ে গপ্পো চলে।

৯) এই যে ইভান! ছেড়ে কাপড়
কড়াইগুলোয় ঝাঁপিয়ে পড় —
ইভানকে তো বললে জারে;
ইভান তখন কাপড় ছাড়ে।

১০) দরকার যা, করবো বটে —
ইভান বলে — হুজুর তবে,
ইচ্ছা করি বিদায় নিতে
মরার আগে ঘোড়ার কাছে;
হুকুম দেন আপনি যদি...
রাজাও শেষে হলেন রাজি।

১১) চাকর এসে টাট্টু নিয়ে
একপাশেতে দাঁড়ায় গিয়ে।
লেজের চামর টাট্টু দোলায়,
কড়াইয়েতে লেজটি ডোবায়,
লাফিয়ে ডিঙোয় ইভানরে দুইটি বার,
লম্বা শিস্ জোরসে দিলো তিনটি বার।

১২) বারেক চেয়ে টাট্টু পানে
মারলো ঝাঁপ এবার ইভান,
দ্বিতীয়টিতে আর পরেরটা,
ধন্যি বটে বুকের পাটা!

১৩) ...যায় না বলা রূপকথাতে
যায় না লেখা কলমেতে
এমন কাণ্ড ঘটলো পরে —
'কী তাজ্জব!' সবাই চে'চায়
'শুনিনি তো এমনো হয়!'
রূপের চমক ইভান ধরে।

১৪) রাজাও কাপড় ছাড়ে এবার
ক্রুশ আঁকলো বুকে দু-বার —
কড়াইয়েতে ডুবলো যেই —
অক্কা পেলো।

এরপর আর কী? জার-তনয়া এগিয়ে এসে ঘোমটা খুলে হাত ধরলো ইভানের। বললো: 'ইভানই হলো আমার পছন্দসই বর।' এরপর দেশের সবাই ইভানকে সম্রাট হিসেবে বরণ করে নিলো, আর তার স্ত্রী জার-তনয়াকে সম্রাজ্ঞী।

...এক বাড়িতে থাকত দুটি মেয়ে — কর্মবতী আর আল্‌সেজাদী, আর তাদের আয়া। কর্মবতী সকাল-সকাল উঠেই কাজে লেগে যেত: চুল্লি ধরাত, ময়দা মাখত, ঘর ধুত, জল আনতে যেত কুয়োতলায়। কখনো ব্যাজার লাগত না তার। আর আল্‌সেজাদী সকালে অনেকক্ষণ গড়াত বিছানায়, তারপর উঠে জানলার কাছে বসে বাইরের কাক গুনত: কতগুলো উড়ে এল, কতগুলোই না গেল উড়ে। সব কাক গোনা হয়ে যাবার পর ভেবে পেত না এবার কী করবে। এমন, একদিন-না...

হিম-বাবাজী ইভানভিচ

(১) একদিন বিপদে পড়ল কর্মবতী: কুয়োতে বালতি নামিয়েছে, এমন সময় ছিঁড়ে গেল দড়ি। কী করা যায়? গেল আয়ার কাছে, কিন্তু কড়া তার মেজাজ। বললে, 'নিজে ফেলেছিস, নিজেই তুলে আন গে।'

(২) উপায় নেই কিছু। মেয়ে কুয়োতলায় গিয়ে দড়ি ধরে নেমে গেল একেবারে নিচে। তখন যা ঘটল-না। নামতেই দেখে...

(৩) সামনে তার চুল্লি, চুল্লিতে লালচে ভাজা-ভাজা পিঠে। পিঠে বললে, 'আমি ভাজা হয়ে গেছি, লাল রঙ ধরেছে। যে আমাকে চুল্লি থেকে বার করে আনবে, তার সঙ্গেই আমি যাব।' শুনে বেলচা দিয়ে কর্মবতী বার করে আনল পিঠে।

(৪) এগিয়ে যায় সে। সামনে বাগান, গাছে আপেল-ফলেরা বলাবলি করছে, 'আমরা পাকা, রসালো আপেল। যে আমাদের ঝাঁকিয়ে ফেলবে, সেই নেবে।' শুনে ডাল ঝাঁকিয়ে মেয়েটি আপেল কুড়িয়ে রাখল এপ্রনে।

(৫) আরো এগোয়। দেখে, বসে আছে বুড়ো হিম-বাবাজী ইভানভিচ। একেবারে সব চুলদাড়ি পাকা। বলে, 'কুশল হোক তোর। আমার জন্যে পিঠে আপেল এনেছিস বলে ধন্যবাদ। জানি কী জন্যে এসেছিস, বালতি তোকে দেব, তবে তার বদলে তিন দিন সেবা কর আমার।'

(৬) ঘরে এল তারা, সে ঘর বরফ দিয়ে বানানো। মেয়েটিকে বিছানা পাততে বললে হিম-বাবাজী, কিন্তু বিছানায় পালকের তোশকের বদলে ঝুরো-ঝুরো তুষারকণা। বুড়োর যাতে শুয়ে আরাম হয় তার জন্যে তুষারকণা চাপড়ে চাপড়ে দিল কর্মবতী, যদিও হাত ওর জমে যাচ্ছিল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুয়ে পড়ল বুড়ো।

ব্যাঙ

রাজকন্যে

রুশ লৌকিক কাহিনীর এ ছবিগুলি কিন্তু পেশাদার শিল্পীর কাজ নয়, এগুলি এঁকেছে ১৫ বছরের ইউলিয়া গুকোভা। স্কুলের ৯ম শ্রেণীতে সে পড়ে, সেইসঙ্গে ললিতকলা বিদ্যালয়েও অনুশীলন করে।

...এক রাজার ছিল তিন ছেলে। একদিন সবাইকে ডেকে সে বললে: 'বুড়ো হতে চলেছি, আমার ইচ্ছে তোমরা বিয়ে করো। এক-একটা তীর নিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে ছোড়ো। তীর যেখানে পড়বে সেখানেই তোমাদের নির্বন্ধ।' বড়ো ছেলের তীর গিয়ে পড়ল ভুঁইয়ার বাড়িতে, ভুঁইয়ার মেয়ে সেটি তুলে নিলে। মেজো ছেলের তীর পড়ল সদাগর বাড়িতে, আর ছোটো ছেলে ইভান রাজপুত্রের তীর উড়ে গেল কে জানে কোথায়! অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে পেঁছল জলায়, দেখে তীর ধরেছে ব্যাঙ। ব্যাঙ বলল: 'আমায় বিয়ে করো, তোমার নির্বন্ধ তাই।'

(১) তিনটে বিয়ে হল... ছেলেদের ডেকে রাজা বললে: 'তোমাদের কোন বৌয়ের হাতের কাজ ভালো তা দেখতে চাই। কালকের মধ্যে একটা করে জামা বানিয়ে দিক তারা।' ছেলেরা কুর্নিশ করে চলে গেল যে যার বাড়িতে।

(২) মাথা হেঁট করলে ইভান, ব্যাঙকে বললে বাপের হুকুমের কথা। 'দুঃখু কোরো না ইভান রাজপুত্র, ঘুমোও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।' ইভান ঘুমোল আর ব্যাঙ তার খোলস ছেড়ে হয়ে গেল বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা। হাততালি দিয়ে সে ডেকে বললে, 'মায়েরা, মাসিরা, সকালের মধ্যে আমায় একটা জামা বানিয়ে দাও যা বাবাকে পরতে দেখেছি।'

(৩) সকালে ঘুম ভেঙে ইভান দেখে, টেবিলের ওপর জামা তৈরি। ভাইয়েরা গেল রাজার কাছে। বড়ো ছেলে তার জামা খুলে দেখাল, রাজার মন উঠল না। মেজো ছেলের বেলাতেও তাই। আর ইভান তার জামা দেখাতে রাজা বললে 'হাঁ, একেই বলে জামা, পরবের দিনে পরবার মতো।'

(৪) এবার নতুন কাজের ভার দিলে রাজা, সকালের মধ্যে রুটি বানাতে হবে। 'দেখতে চাই কোন বৌমা ভালো রাঁধে।' ফের মন ভার হল ইভানের, ফের তাকে সান্ত্বনা দিলে ব্যাঙ। ঘুমোতে গেল ইভান। আর অন্য যে বৌয়েরা আগে ইভানকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল তারা ঠিক করল চালাকি খাটাবে।

(৫) ব্যাঙ কী করে দেখতে পাঠাল এক বুড়িকে। সেটা টের পেয়ে ভাসিলিসা ময়দা মেখে তালটা স্রেফ উনুনের মধ্যে ফেলে দিলে। বুড়ি ব্যাপারটা বললে বৌমাদের, তারাও তাই করলে।

(৬) ভাসিলিসা পরে মা-মাসিদের ডাকলে, নানান নকশা আঁকা রুটি বানালে তারা।... বাপের কাছে এল ভাইয়েরা। বড়ো ভাইদের রুটি তো নয়, পোড়া আবর্জনা। আর ইভানেরটা দেখে রাজা বললে, 'হাঁ, একেই বলে রুটি, পরবে খাওয়ার মতো।'

(৭) রাজা তিন ছেলেকে হুকুম দিলে, পরের দিন বৌদের নিয়ে ভোজে আসতে।... ব্যাঙকে সে কথা বললে ইভান। ব্যাঙ বলে, 'দুঃখ কোরো না, ভোজে তুমি যেও একলা, আমি যাব পরে।' শিখিয়ে দিলে কী বলতে হবে।

(৮) ভোজে জুটেছে সবাই, ইভান রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে: 'রুমালে করে বৌকে নিয়ে আসলেও পারতিস!' খেতে বসেছে, এমন সময় দুড়্দাড়্ শব্দ। ভয় পেয়ে গেল সবাই। ইভান বলে: 'ভয় নেই অতিথিসজ্জন, আমার ব্যাঙ আসছে বাক্সে চেপে।' গাড়ি এসে থামতে বেরিয়ে এল বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা...

(৯) খানা হল, পিনা হল, শুরু হল নাচ। ইভানকে নিয়ে নাচতে লাগল ভাসিলিসা। সে কী নাচ, ওরা সবাই অবাক মানে। ইভান রাজপুত্র ওদিকে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে ছুটল বাড়ির দিকে...

(১০) ...ব্যাঙের খোলস ফেলে দিল উনুনে। বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা ফিরে এসে সব বুঝল। মন খারাপ করে বললে, 'হায়, কী করেছ ইভান রাজপুত্র, এবার বিদায়। তিন দশের রাজ্যে অমর কাঁকলাশের কাছে আমার খোঁজ কোরো।' এই বলে পাখি হয়ে সে উড়ে গেল জানলা দিয়ে। কে'দে-কেটে ইভান বেরুল তার বৌয়ের খোঁজে।

(১১) চলল অনেক দিন। বনে দেখা এক বুড়োর সঙ্গে। সে বললে, 'জানি তোর দুঃখের কথা। তোর বৌ আছে অমর কাঁকলাশের কাছে। তার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তার মরণ আছে সূঁচের ডগায়, সূঁচ আছে ডিমে, ডিম হাঁসে, হাঁস আছে খরগোশে, আর খরগোশ যে সিন্দুকে আছে সেটা রয়েছে উ'চু ওক গাছের ডগায়।' ইভানের সাফল্য কামনা করে সে তাকে দিলে সুতোর গুটি।

(১২) গুটি যেদিকে গড়ায়, সেদিকে যায় ইভান। পথে দেখা এক ভালুকের সঙ্গে। মারবে বলে ইভান তীর-ধনুক বাগিয়েছে, ভালুক তাকে বললে মানুষের গলায়: 'মেরো না আমায়, তোমার কাজে লাগব।' ভালুকের জন্যে মায়া হল ইভানের।

(১৩) চলল আরো এগিয়ে। দেখে মাথার ওপরে উড়ছে হাঁস। তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরতেই হাঁস বললে মানুষের গলায়: 'মেরো না আমায়, তোমার কাজে লাগব।' হাঁসের জন্যেও মায়া হল ইভানের।

(১৪) চলল আরো এগিয়ে। দেখে এক ট্যারাচোখো খরগোশ। তাকেও মারলে না ইভান। আর মানুষের গলায় খরগোশ বললে, 'ধন্যবাদ ইভান রাজপুত্র, আমি তোমার কাজে লাগব।'

(১৫) নীল সাগরের কাছে এল ইভান: দেখে তীরে, বালির ওপর পড়ে আছে পাইক মাছ, প্রায় মরোমরো, বলে, 'দয়া করো ইভান রাজপুত্র, নীল সাগরে ছেড়ে দাও আমায়।' মাছকে জলে দিয়ে ইভান চলল আরো এগিয়ে।

(১৬) গুটি গড়িয়ে গেল বনে। বনে এক ওক গাছ, তার ওপরে সিন্দুক। কিন্তু সেখানে ওঠা কঠিন। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল ভালুক, শিকড় থেকে উপড়ে ফেললে গাছকে, সিন্দুক আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল। সিন্দুক থেকে বেরিয়ে ছুটল খরগোশ। অন্য খরগোশ তার পিছু ধাওয়া করে কামড়ে তাকে কুটিকুটি করল।

(১৭) খরগোশ থেকে বেরিয়ে হাঁস উড়ল আকাশে। অন্য হাঁস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোকর দিলে। হাঁসের ডিম খসে পড়ল সাগরে। আর ডিম মুখে করে সাগর থেকে ভেসে এল পাইক মাছ। ডিম ভেঙে ইভান চুরমার করলে সূঁচের ডগা...

(১৮) মরতে হল কাঁকলাশকে। ইভান রাজপুত্র গেল তার শ্বেত পুরীতে। বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা ছুটে এল তাকে বরণ করতে, চুমু খেল তার মিষ্টি ঠোঁটে। দুজনে মিলে ফিরে এসে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাল বহুকাল।

গড়ানে-মটর—
মটরশিশু—
হল ইউক্রেনীয় রূপকথার
এক আদরের নায়ক।
দেখতে ছোটো
হলেও সাহস তার অসীম,
বিপুল তার শক্তি,
অনায়াসে হারিয়ে
দেয় সব শত্রুদের।
ঐ রূপকথা অবলম্বনে
কিয়েভ থেকে নির্মিত
হয়েছে একটি কার্টুন ফিল্ম।
তার চিত্রনাট্যকার
গ্রিগরি গুজ্ভা,
পরিচালক বরিস খ্রানেভিচ,
এবং শিল্পী-প্রযোজক
ইউরি স্কির্দা।

১) বড়ো বড়ো ক্ষেতের মাঝখানে শাদা এক কুঁড়িতে থাকত এক বুড়ো-বুড়ি। ছিল তাদের তিনটি খাসা ছেলে আর পরমাসুন্দরী এক মেয়ে ওলেন্কা।

২) একবার ভাই-বোনেরা গেল মাঠে, ফসল পেকেছে, কাটতে হবে। ভাইয়েরা ফসল কাটে, ওলেন্কা আঁটি বাঁধে। এমন ফুর্তি করে কাজ চলল যে আকাশে হাসি ফুটল সূর্যের মুখেও।

৩) হঠাৎ অন্ধকার হয়ে উঠল আকাশ, হয়ে উঠল বেগুনী, লালচে। যেন ছুটে এসেছে কোনো কালো মেঘ। তবে মেঘ নয়, ভয়ঙ্কর সে এক শঙ্খমুণ্ড নাগ। বন্দী করে নিয়ে গেল ওদের।

৪) কাঁদে বুড়ো-বুড়ি: 'কে আর এখন আমাদের দেখাশোনা করবে? ছেলেমেয়েরা নেই।' দেখে মাটি ফুঁড়ে বেরচ্ছে মটর গাছ। শুঁটি থেকে লাফিয়ে নামল একটি খোকা: 'দুঃখ কোরো না, কোনো নাগের নিস্তার নেই।'

৫) '...আমি গড়ানে-মটর। ভাইদের উদ্ধার করতে যাব।' চলল গড়ানে-মটর নাগের সঙ্গে লড়তে। তবে অমন ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে কি বিনা অস্ত্রে লড়া যায়?

৬) 'কামার, ও কামার, গদা গড়ে দাও আমায়!' লোহার এক ভারি গদা বানালে কামার, ছেলেটা তাকে এক আঙুলের চাপেই বেঁকিয়ে দিলে। আরো ভারি গদা বানাতে হল কামারকে।

৭) যেতে যেতে যেতে গড়ানে-মটর দেখে খেতে বসার উদ্যোগ করছে এক দল মহাবীর: পাহাড়-ঠেলিয়ে, ওক-উপড়ানো আর পাকানো-মোচ। 'আমায় তোমাদের সঙ্গে নাও,' অনুরোধ করলে গড়ানে-মটর।

৮) হেসে উঠল বীরেরা: 'পথ মাপো বাপু, আমাদের যুগ্যি নও তুমি।' রেগে গিয়ে গড়ানে-মটর গদা দিয়ে ঘা মারলে মাটিতে। তার শক্তি দেখে তখন মহাবীররা সাহায্য করতে লাগল তাকে।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

৯) শুনতে পেলে নাগ, বন্ধুবান্ধব নিয়ে গড়ানে-মটর আসছে তার বিরুদ্ধে। ডুক-ডাক করলে নাগ, পথে ওদের জেগে উঠল বড়ো বড়ো পাহাড়। পাহাড়-ঠেলিয়ে সরিয়ে দিলে পাথরের বাধা, চলল বন্ধুরা এগিয়ে।

১০) ভয় পেল নাগ, ব্যাপার সুবিধের নয়। একশ বছরের এক গাছের বন জেগে উঠে পথ আটকাল। এবার ওক-উপড়ানের কেরামতি দেখাবার পালা। বন্ধুদের দিকে চোখ মটকে সে গাছ ওপড়াতে লাগল এমন ভাবে যেন ঘাস ছিঁড়ছে।

১১) নাগ দেখে শিয়রে সংক্রান্তি। নিজের রুমালটা সে ছুড়ে দিলে মাটিতে, অমনি তা সমুদ্র হয়ে গেল, এড়ানো যায় না, পেরনো যায় না। তখন পাকানো-মোচ এগিয়ে গিয়ে মোচে তা দিয়ে ফুঁ দিলে জলে — সরে গেল সমুদ্র।

১২) আর উপায় নেই, যুদ্ধে নামতেই হল নাগকে। নাক দিয়ে ভয়ঙ্কর আগুন ঝরিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গড়ানে-মটরের ওপর।। শুরু হয়ে গেল লড়াই। গদা তুললে গড়ানে-মটর ...

১৩) ... তারপর এমন জোরে মারলে যে মাটিতে দেবে গেল নাগ। গড়ানে-মটর খোকনের গদার আরেক ঘায়েই উড়ে গেল দানবের চার-চারটে মুণ্ড।

১৪) কিন্তু পঞ্চম মুণ্ডটার কথা তার মনে ছিল না। সবে একটু জিরতে বসেছে, অমনি পায়ের তলে দুলে উঠল মাটি, এগিয়ে এল নাগের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মুণ্ডটা।

১৫) একটুও ভড়কে না গিয়ে গড়ানে-মটর পাক দিতে লাগল মুণ্ডটার চার পাশে। মুণ্ডও তার পেছু পেছু। গলার ওপর তা ঘুরেছে তো ঘুরেছেই, গড়ানে-মটরকে আর ধরতে পারে না।

১৬) গলার ওপর ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল মুণ্ডটা। এই সময় সুযোগ বুঝে গড়ানে-মটর তার গদাটি কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে শেষ ঘা মারলে নাগের মাথায়।

১৭) ভয়ঙ্কর নাগ আর নেই। ধসে পড়ল নাগের ঘরবাড়ি প্রাসাদ, ছুটে এল নাগের বন্দী, গড়ানে-মটরের বোন আর ভাইয়েরা।

১৮) সাহায্যের জন্যে পাহাড়-ঠেলিয়ে, ওক-উপড়ানো আর পাকানো-মোচকে ধন্যবাদ দিলে গড়ানে-মটর। ভাইয়েরা আর বোন ওলেঙ্কাও তাদের রক্ষাকর্তার সঙ্গে চলল বাড়িতে, বুড়ো-বুড়ি যেখানে পথ চেয়ে আছে তাদের।

মাঠের মেয়ে

ছোটোদের জন্যে এবারের উপহার জর্জিয়ার একটি রূপকথা। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ফিল্ম স্ট্রিপের অনুচিত্রনে আছেন শিল্পী ভাসিলি ইগনাতভ।

এক যে ছিল বুড়ো। মরার সময় হতে ছেলেকে ডেকে সে বললে, 'তোর তিন বোনকে বিয়ে দে। পাত্রের তত্ত্বতল্লাশ করবি না, যে প্রথম আসবে তার হাতেই তুলে দিবি।' ছেলেও ঠিক তাই করলে। বরদের চেনে না সে, মন খারাপ হয়ে গেল তার। সে খবর পেয়ে রাজারও দুঃখ হল। তাকে সে করলে নিজের সেনাপতি।

এ শুধু অবতরণিকা। আর গল্পটা এই:

একদিন সৈন্যদল গেল শিকারে। দ্যাখে, মাঠের ফুল থেকে ফুলে লাফিয়ে যাচ্ছে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে। ঘোড়সওয়াররা সবাই ধাওয়া করলে তার দিকে, কিন্তু কোথায়! শুধু সেনাপতির ঘোড়া কোনো রকমে পাল্লা দিয়েছিল, তাও পড়ে গেল। চোখ মেললে কুমার, অচেনা জায়গা, সৈন্যেরাও নেই, মেয়েটিও নেই। বসে বসে দুঃখ করতে লাগল সে।

এমন সময় মেয়েটি এসে বসল একটা ফুলের ওপর, 'বসে বসে কাঁদছ, লজ্জা হয় না। তাকিয়ে দ্যাখো।' উঠে দাঁড়িয়ে কুমার দ্যাখে দূরে একটা বাড়ি। বাড়িতেই ঢুকতেই সেখানে তার বড়দি। কোলাকুলি করলে, চুমু খেলে। ভাই বললে মাঠে কী আশ্চর্য জিনিস দেখেছে 'তার রূপ আমায় আকুল করেছে। ছুটে গেলাম, শুধু খোয়া গেল ঘোড়াটা।'

'ও যে মাঠের মেয়ে। তাকেই সে বিয়ে করবে যে তার পাল্লা ধরতে পারবে।' বললে দিদির বর — যাদুকর ঈগল। 'মায়া ক'রো না, তোমার ঘোড়াটা দাও, ধন্য বলব।' দিলে ঘোড়া, তবে সেটাও লুটিয়ে পড়ল। দুঃখু হল কুমারের। তবে বোধ হয় মেয়েটির মনে ধরেছিল সে। ফের সে বললে, 'দুনিয়া অপার, কোথাও কিছু পাবে হয়ত।' তাকিয়ে দ্যাখে, দূরে একটা বাড়ি। সেখানে থাকে তার মেজো বোন আর স্বামী। কুমারকে উৎসাহ দিলে না জামাই। 'বাদ দে। মাঠের মেয়ের পেছনে ছুটে নিজেরই প্রাণ হারাবি।' তবে ঘোড়া দিলে।

সে ঘোড়াও পারল না। দুঃখে কেঁদে ফেললে কুমার। 'পুরুষ হলে নিজের পায়ে দাঁড়াও,' — বললে মেয়েটি। শক্তি ফিরল তার,

একটা হাঁটাপথ ধরে সে পৌঁছল তার ছোড়দির কাছে। তার বরও তাকে ফেরাবার চেষ্টা করলে। তবে ঘোড়া দিতে আপত্তি করলে না।... কিন্তু ফের হতাশ হল কুমার, মেয়েটি ফের তাকে বললে, 'চারিদিক তাকিয়ে দ্যাখো। শুভ পাও, অশুভ পাও, নিজের কাজে লাগাও।'

এগিয়ে যেতে কুমার দ্যাখে মারামারি করছে তিনটে পিশাচ, ঠিক করতে পারছে না, গালিচা বুরুশ আর শান পাথরের কে কোনটা নেবে।

বুরুশ আর শান পাথর বাগিয়ে কুমার বসল গালিচায়, হাঁক দিল, 'এই গালিচা!'

অমনি বাতাসের

চেয়েও বেশি জোরে উড়ে চলল গালিচা। মাঠের মেয়েকে এই ধরে ধরে, হঠাৎ সামনে দেখা দিল পাহাড়। মেয়েটি উড়ে গেল তার ভেতর দিয়ে। 'এই বুরুশ!' হুকুম করলে কুমার। অমনি মই এসে গেল পাহাড়ে, আর তা বেয়ে উঠল গালিচা। পৌঁছল মস্তো সাগরে। মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। কুমার ছুঁড়ে দিল তার শান পাথর। অমনি শুকিয়ে গেল সাগর। মেয়েটিকে প্রায় ধরে ধরে, হঠাৎ সে গোত্তা মেরে ঢুকে পড়ল তার বাপের বাড়িতে।

বেরিয়ে এল বাবা। কুমারের সঙ্গে কোলাকুলি করে চুমু খেয়ে বললে, 'যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমন জামাইই পাওয়া গেল।'

মের্গেন আর তার বন্ধুবান্ধব

নানাই কাহিনী অবলম্বনে এই নামে বেরিয়েছে 'দিয়াফিল্ম' স্টুডিওর নতুন ফিল্ম (শিল্পী ভাসিলি ইগ্নাতভ)। নানাইরা আমাদের দূর প্রাচ্যের একটি জাতি। যুগ যুগ ধরে তারা মাছ আর পশু শিকারে নিপুণ। কাহিনীর নায়ক মের্গেনও ভালোবাসত টলটলে নদীতে মাছ ধরতে, যেত শিকারে, খালি হাতে কখনো ফিরত না। যেমন ছিল তার সাহস, তেমনি মনে দয়ামায়া।

একবার শিকারে গেল সে, গেল একেবারে গহনে। দেখে, চোরাপাঁকে আটকে গেছে এক হরিণ।

১) হরিণ বললে, 'পাঁক থেকে উদ্ধার করো আমায়।' মায়া হল শিকারীর, টেনে তুলল তাকে। হরিণ বললে, 'এর প্রতিদান দেব তোমায়। দরকার পড়লে আমায় ডেকো।'

২) এগিয়ে যায় মের্গেন, কীটপতঙ্গের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। চোখে পড়ল পিঁপড়ে, গাছের গুঁড়ির চাপা পড়ে প্রাণ যায় আর কি। মায়া হল শিকারীর, বাঁচালে তাকে। 'ধন্যবাদ মের্গেন, এ ঋণ শোধ দেব।'

৩) আমুর নদীর তীর দিয়ে যায় মের্গেন। কানে এল, 'বাঁচাও মের্গেন, কালুগা আমার বালিতে ভরে গেছে।' দেখে, তীরে পড়ে আছে মস্তো এক কালুগা মাছ। ঠেলাঠেলি করে তাকে সে জলে নামিয়ে দিলে। 'তোমার কাজে লাগব' বলে কালুগা তলিয়ে গেল।

৪) একদিন যায়, দু'দিন যায়, মের্গেন গিয়ে পৌঁছল এক গ্রামে। অনেক ছোকরা সেখানে। সবচেয়ে বড়ো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল বুড়োবুড়ি। মের্গেন বললে, 'তাইগায় শিকার করছিলাম। ভাবলাম, আপনাদের গাঁয়ে এসে একটু জিরিয়ে নিই।'

৫) দরজায় দেখা দিল এক সুন্দরী। 'কী, আমার মেয়েকে ভালো লাগল?' জিজ্ঞেস করলে বুড়ো। মের্গেন বললে, 'আমুরে সুন্দরী আছে অনেক, কিন্তু এমনটি কখনো দেখি নি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।' বুড়ো বললে, 'অত সহজ নয়। শতেক শিকারী আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সবাই তারা এখন আমার চাকর।'

৬) 'তিনটে কাজের ভার দেব। পারলে আমার জামাই হবে, নইলে চাকর।' বুড়োর হুকুমে চাকর-বাকরেরা নিয়ে এল এক জোড়া লোহার জুতো বুট। 'এক হাতে পরে ক্ষয় করতে পারলে এসো, পরের ভার দেব।' বললে বুড়ো।

৭) বুট নিয়ে মের্গেন চলে গেল তাইগায়। ভাবে, 'এ জুতো পরে ক্ষয় করতে সারা জীবন লাগবে।' হঠাৎ মনে পড়ল হরিণের কথা, ডাকতে লাগল তাকে। হরিণ ছুটে আসতে মের্গেন বললে তাকে তার বিপদের কথা।

৮) হরিণ কিছুই না বলে সামনের পা-জোড়ায় বুট পরে ছুটে গেল পাহাড়ে। সকালে রোদ ফুটতেই ফিরে এল হরিণ। লোহার বুটের টিকে আছে শুধু ওপরটা।

৯) 'প্রথম কাজটা ভালোই করেছ,' বলে বুড়ো পাঁচ বস্তা জোয়ার আনতে বললে চাকরদের। সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল তা। 'এবার মের্গেন সব জোয়ার খুঁটে তোলো, একটিও যেন না হারায়। একদিন সময়।'

১০) মাঠে চলে গেল মের্গেন, মাটিতে শুয়ে ডাকলে, 'পিঁপড়ে, এসো বন্ধু, আমায় একটু উদ্ধার করো।' পিঁপড়ে ছুটি ছুটি আসতেই শিকারী তাকে বললে কী কাজ দিয়েছে বুড়ো।

১১) পিঁপড়ে ডাক দিলে তার ভাইদের। দেখতে না দেখতেই এত পিঁপড়ে এসে জুটল যে গাঁয়ের মাটি ছেয়ে গেল। মের্গেন তার পাইপ খেয়ে শেষ করতে না করতেই সব জোয়ার খুঁটে তুলে বস্তাবন্দী করে দিল তারা।

১২) অবাক মানল বুড়ো। মাথা চুলকে বললে, 'তা এবার তিন নম্বর কাজ। অনেকদিন আগে আমার বাবার সোনার আংটি পড়ে যায় আমুরের জলে। কোথায় পড়েছে কেউ জানে না। সন্ধের মধ্যে খুঁজে আনো।'

১৩) আমুরে গিয়ে মের্গেন ডাকলে কালুগাকে, 'কালুগা, সব মাছের রাণী, এসে আমায় বাঁচাও।' টগবগ করে উঠল আমুরের জল, ফেনিয়ে উঠল, ভেসে এল কালুগা মাছ। মের্গেন তাকে বললে তার বিপদের কথা।

১৪) আমুরের সব মাছকে জড়ো করলে কালুগা, তাদের আঁশে রুপোলী হয়ে উঠল জল। রাণীর হুকুম তামিল করতে দিগ্‌দিকে ছুটল তারা। আমুরের তল পাতি পাতি করে খুঁজে নিয়ে এল আংটি।

১৫) মের্গেন সে আংটি এনে দিল বুড়োকে। মেয়েকে বুড়ো মের্গেনের কাছে এনে বললে, 'এই নাও গো সাহসী শিকারী, আমার মেয়ে। সেই আমাদেরও সঙ্গে নিও, আর আমার চাকর-বাকরদের।'

১৬) 'বেশ' বললে মের্গেন, 'তবে আমাদের মধ্যে মনিব-চাকর কেউ থাকবে না। সবাই আমরা হব বন্ধু।'

হলও তাই। মিলে-মিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাল তারা।

মায়া-মুকুর

১) এক-দেশে ছিল রাজা। সবই তার আছেল। কিন্তু জরা যে তাকে ছাড়ে না। দরজা দিয়ে বার করে দেয়, জানলা দিয়ে ফিরে আসে। ভাবনা হল রাজার।

২) বড়ো দুই ছেলেকে ডাকলে রাজা। বললে, 'দুনিয়ায় আছে এক মায়া-মুকুর, তাতে মুখ দেখলে লোকে জোয়ান হয়ে যায়। আমায় এনে দাও, অর্ধেক রাজত্ব দেব তোমাদের।'

৩) ছয় ঘোড়ার গাড়ি জুড়ে মোহরের বস্তা চাপিয়ে রওনা দিলে দু'জন। ছোটো ছেলের কানে এল কথাটা।

৪) বলে, 'আমিও যাই।' রাজা বলে, 'তুই এখনো ছোটো, জ্ঞানগম্যি নেই।' কিন্তু ছেলের পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বললে, 'বেশ যাও, তবে আমার সাহায্যের ভরসা রেখো না।'

৯) কিছু মেজ-দিও জানত না। বললে, 'আরো এগিয়ে যা বাছা, তিনদিনের দিন পৌঁছবি আমাদের বড়দির কাছে।'

১০) জীবন্ত মানুষ দেখে বড়দিও অবাক হল। রাজপুত্র তাকে বললে মায়া-মুকুরের কথা। বুড়ি বললে, 'আমার এখানে থাকো। দাস-দাসীদের ডাকব, কেউ হয়ত জানে।'

১১) জানলার কাছে বসে রাজপুত্র তাকিয়ে দেখে: শিস দিলে বুড়ি, এসে জুটল বনের যত পশু, যত পাখি। কিন্তু আয়নার হদিশ কেউ জানে না।

১২) আরেক বার শিস দিলে বুড়ি। এসে নামল বুড়ো-হাবড়া এক প্রকাণ্ড বাজ পাখি। 'আজ্ঞা করুন বন-জননী।'

১৭) চলে গেল সোজা রাজকন্যের নিদ-মহলে। চট করে মায়া-মুকুর নিয়ে চলে যাবে, সাধ হল একবার কন্যেকে দেখে।

১৮) দেখে একেবারে মুগ্ধ। এমন রূপ সে জীবনে দেখে নি। কন্যের আঙুলে সোনার অঙ্গুরী। 'এটা থাকবে আমার স্মৃতিচিহ্ন,' এই ভেবে সে আলগোছে খুলে নিলে আঙটি।

১৯) ওদিকে জেগে উঠে গর্জে উঠল ভালুকেরা, তবে তার আগেই ছোঁ মেরে রাজপুত্রকে পিঠে চাপিয়ে নিলে বাজ। ফিরে এল এক গহন বনে।

২০) বুড়ির মুখের সামনে আয়না তুলে ধরল রাজপুত্র। 'বয়স আমার অনেক বাছা, আমার কিছু হবে না।... বরং এই পালক-গোছা নাও, দোলালেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

২৫) ঘরে ফিরল ছোটো ছেলেও, বলে — আয়না এনেছে সে-ই। কিন্তু কেউ কান দেয় না। আপদ একেবারে জন্যে দাদারা তাকে তুলে দিলে এক ডিঙিতে ...

২৬) ... আর ঠেলে দিলে তা সমুদ্রে, হাল-দাঁড় কিছুই তার নেই। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডিঙি পৌঁছল নির্জন এক দ্বীপে। 'কী করি এবার?' খেদ করে উঠল রাজপুত্র।

২৭) মনে পড়ল বুড়ির কথা। পালক-গোছা দুলিয়ে বললে: 'লোকজনে ভরা বড়ো এক নগর হোক এখানে।'

২৮) দেখতে-দেখতে জেগে উঠল সুন্দর এক নগর। লোকে তা লোকারণ্য, তবে সবাই কাঙাল, পরনের কাপড়টুকুও নেই।

পত্রিকায় আমরা লোক-কাহিনী ছাপি নিয়মিত, যাতে সাইবেরিয়ার তোমস্ক শহরের পাঠক ক. মালীশেভের মতে, 'সর্বদাই হয় সত্যের জয়, শেখায় উদারতা, সাহস, ন্যায়পরতা।' এবার একটি এস্তোনীয় কাহিনী, লোককথা অবলম্বনে তা লিখেছেন ইউ. কুন্দের, ছবি এ'কেছেন 'তাল্লিন-ফিল্ম' স্টুডিওর চিত্রকরী ভ. কেস্বের-বগার্ৎকিনা।

৫) অল্প টাকায় বুড়ো এক ঘোড়া কিনে সন্ধ্যায় ছোটো রাজপুত্র কোনোরকমে পৌঁছল এক মস্ত সরাইখানায়। দেখে, আঙিনায় দাদাদের ঘোড়া। ভারি আনন্দ হল: 'এবার একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

৬) 'পথ দেখে আর বাঁচি না,' হাসাহাসি করতে লাগল দাদারা, 'কী করতে এলি? রাস্তায় তোর ভার বইবে কে?' ছোটো রাজপুত্র কিছু না বলে চলে গেল।

৭) পৌঁছল এক মস্তো বনে। দেখে, এক কুটির। কুটির থেকে বুড়ি বেরিয়ে এসে বলে, 'কত দিন কাটালাম। পুরনো বন মরে গিয়ে নতুন বন গজিয়ে উঠল, মানুষ তো কখনো দেখি নি।'

৮) 'আমায় পথ বলে দাওনা দিদিমা!' কিন্তু মায়া-মকুরের কথা বুড়ি কখনো শোনে নি। 'হয়ত আমার মেজ-দি জানে, এখান থেকে তিন দিনের পথ।'

১৩) আয়নার কথা জিজ্ঞেস করলে বুড়ি। বাজ বললে, 'জানি, দূরে সমুদ্রে দুর্গম দ্বীপ। রাজকন্যে থাকে সেখানকার কেল্লায়। আয়না তারই কাছে।'

১৪) 'ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে উড়ে যা বাছা। নিয়ে আয় আয়নাটা।' ডানা মেলে বাজ সমুদ্র উড়ে গেল রাজপুত্রকে নিয়ে।

১৫) এসে নামল দ্বীপটায়। বাজ বললে, 'রাতে যেও কেল্লায়। আয়না থাকে রাজকন্যের শিয়রে।' বুড়ো পালক ছিঁড়ে দিলে। 'দেউড়িতে থাকে দুই ভালুক, ছুঁড়ে দিও তাদের দিকে।'

১৬) কেল্লার কাছে যেতে না যেতেই প্রকাণ্ড দুই ভালুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। কিন্তু বাজের পালক গায়ে ঠেকতেই তারা লুটিয়ে পড়ল ঘুমে।

২১) মায়া-মকুরের মেজো দিদিরও কোনো ফল হল না। রাজপুত্রকে একটা থলি দিলে সে: 'তোমার খাবার দরকার হলে থলির বাঁধনটা খুলো...'

২২) ছোটো বোনও বললে, মায়া-মকুরের কাজ সেরে না, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে বাছা।' এক জোড়া কাঁচি দিয়ে বললে, 'পোষাক লাগলে কাঁচিটা চালিও।'

২৩) ফেরার পথে রাজপুত্র দেখে দাদাদের ঘোড়া তখনো সেই সরাইখানায়। সরল মনে গিয়ে তাদের সবকিছু বললে। কোথায় গেছে, কী পেয়েছে।

২৪) কুটিল দাদারা কিন্তু আয়নাটি কেড়ে নিলে। নিজেরাই তা নিয়ে গেল রাজার কাছে। আয়নায় মুখ দেখতেই জোয়ান হয়ে গেল রাজা। অর্ধেক রাজত্ব এবার দিতে হয়।

২৯) মনে পড়ল কাঁচির কথা। কাঁচি চালাতে লাগল সে, দেখতে না দেখতেই লোকজনের গায়ে উঠল পোষাক, পায়ে জুতো।

৩০) তবে তাতে কি আর পেট ভরে! এবার বাঁচাল থলিটা। খেয়ে দেয়ে দিন কাটাল লোকে। ওকেই করলে রাজা। শিগগিরই কনেও জুটল সুন্দরী।

৩১) এল সে সাগর পার হয়ে। বললে, 'আমার হারানো আংটি যে ফিরিয়ে দেবে তাকেই বিয়ে করব।' আর আংটি, সে তো ওই রাজকুমারের কাছেই।

৩২) তাহলে বিয়ের আর দেরি কেন! ধুমধাম করলে সারা রাজ্যের লোক। আর মায়া-মকুর নিয়ে দুঃখ ওদের নেই, কেননা বুড়ো হতে তো এখনো ঢের ঢের দিন বাকি।

এই জনপ্রিয় রুশ রূপকথাটি নিয়ে 'ভায়াফিল্ম' স্টুডিওয় নতুন ফিল্ম তৈরি হয়েছে। ছবি এঁকেছেন শিল্পী প. ভাগিন।

কোন এক দেশে, কোন এক রাজ্যে বেরেন্দেই নামে এক রাজা ছিল। তার ছিল তিন ছেলে, ছোটটির নাম ইভান। রাজার ছিল এক বাগান, সেখানে এক আপেল গাছ ছিল, তাতে ফলত সোনালি আপেল। রোজই কে যেন বাগানে ঢুকে সোনালি আপেল চুরি করে নিয়ে যায়। দেখে তো রাজার মেজাজ বেজায় বিগড়ে গেল। ছেলেরা ঠিক করল পাহারা দিয়ে চোর ধরবে। প্রথমে বড় ছেলে, তারপর মেজো ছেলে রাতে পাহারায় রইল — কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে এলো ইভানের পালা। মাঝরাত কেটে যেতে সে যেন বাগানে একটা আলো দেখতে পেল। ইভান দেখে আপেলগাছে আগুনরঙা পাখি বসে সোনার আপেল ঠোকরাচ্ছে।

তার পর...

রাজকুমার ইভান ও ছাইরঙা নেকড়ে

১। রাজকুমার ইভান চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে আপেল গাছের কাছে এসে পাখির ল্যাজ চেপে ধরল। পাখি ঝাপটা মেরে উড়ে গেল, রাজকুমারের হাতে রয়ে গেল তার ল্যাজের একটি পালক। ইভান বাবাকে সব কিছু বলল।

২। রাজার সাধ হল আগুনরঙা পাখিটা চাই। ছেলেদের ডেকে বললে: 'সারা দুনিয়া ঘুরে দেখলে কোথাও-না-কোথাও কি আর আগুনরঙা পাখিটার দেখা পাবে না?' ছেলেরা ঘোড়ায় জিন কষে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ল।

৩। রাজকুমার ইভান বহুক্ষণ পথ চলেছে। ক্লান্ত হয়ে সে ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নিজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখে ঘোড়া নেই। হাঁটে, হাঁটে, আর খোঁজে — শেষে খুঁজে পেল ঘোড়ার একেবারে চাঁছাপোঁছা হাড়গোড়। মন খারাপ হয়ে গেল: ঘোড়া ছাড়া অ্যাদ্দুর যায় কী করে?

৪। কোত্থেকে ছুটে এলো এক ছাইরঙা নেকড়ে। 'এমন মনমরা কেন রাজকুমার ইভান?' ইভান তার দুঃখের কথা বলল। ছাইরঙা নেকড়ে বললে: 'তা আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করব।' ইভান তার পিঠে চেপে বসল, ছাইরঙা নেকড়ে ছুটল...

৫। ছুটতে ছুটতে ওরা এসে হাজির এক উঁচু দুর্গের সামনে। ছাইরঙা নেকড়ে বললে: 'দেয়াল বেয়ে ঢুকে পড়, পাহারাদাররা সবাই ঘুমোচ্ছে। দুর্গের ভেতরে দেখতে পাবে একটা জানলা, জানলায় আছে সোনার খাঁচা, খাঁচায় আছে আগুনরঙা পাখি। পাখি নাও, তবে দেখো, খাঁচা ছুঁয়ো না কিন্তু!'

৬। ইভান আগুনরঙা পাখি নিল, তারপর খাঁচার দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না: 'ওঃ, কেমন সোনার আর কী দামী খাঁচা!' নেকড়ে তাকে কী বলেছিল তা ভুলেই গেল। খাঁচা ছুঁয়েছে কি ছোঁয় নি অমনি সারা দুর্গে হুলস্থুল পড়ে গেল: কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল, পাহারাদারদেরও ঘুম ভেঙে গেল।

৭। ইভানকে তো পাকড়াও করে রাজা আফ্রোনের কাছে নিয়ে আসা হল। রাজা রেগে আগুন, জিজ্ঞেস করলে: 'কে তুই, কোত্থেকে এসেছিস?' 'আমি রাজকুমার ইভান।' 'তা তুই, যদি সোনালি কেশরওয়ালা ঘোড়া এনে দিতে পারিস তা হলেই তোকে মাপ করব, সোনার খাঁচাসুদ্ধ আগুনেরঙা পাখিও দেব।'

৮। ইভান নেকড়ের কাছে গেল। নেকড়ে বলল: 'ঠিক আছে, আমার ওপর চেপে বস।' ছুটতে ছুটতে ওরা আর এক দুর্গে এসে হাজির। নেকড়ে বললে: 'দেয়াল বেয়ে ঢুকে পড়, ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া নাও, তবে দেখো, লাগাম ছুঁয়ো না কিন্তু!'

৯। রাজকুমার ইভান তো সোনালি কেশরওয়ালা ঘোড়া ধরল, কিন্তু লাগামের লোভও ছাড়তে পারল না। পাহারাদাররা ওকে পাকড়াও করে রাজা কুস্মানের কাছে নিয়ে গেল। 'যদি তুই রাজা দাল্মাতের মেয়ে চুরি করে আমার কাছে আনতে পারিস তা হলে লাগামসুদ্ধ সোনালি কেশরওয়ালা ঘোড়া তোকে উপহার দেব।'

১০। রাজকুমার ইভানের মনখারাপ হয়ে গেল। নেকড়ে বললে: 'আমার কথা ত শুনলে না, ...তা যাক গে, আমার পিঠে চেপে বস।' ছুটতে ছুটতে ওরা রাজা দাল্মাতের ওখানে এসে পেঁছিল। নেকড়ে বললে: আমি নিজেই যাব। আর তুমি ফিরতি পথ ধর, শিগ্গিরই তোমার নাগাল ধরছি।'

১১। ছাইরঙা নেকড়ে তো দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকল, তারপর ঝোপের আড়ালে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ইয়েলেনা সুন্দরী বেরিয়ে আসতেই তাকে ধরে পিঠের ওপর ফেলে দে ছুট। রাজকুমার ইভানের নাগাল ধরে বললে: 'চট্পট্ আমার পিঠে চেপে বস, ওরা যেন আমাদের পিছু না নিতে পারে।'

১২। ওরা রাজা কুসমানের রাজ্যে এসে হাজির। 'কী ইভান, মন খারাপ কেন?' — নেকড়ে জানতে চাইল। 'মন খারাপ হবে না তো কী? এমন সুন্দরী! ইয়েলেনা সুন্দরীকে ছেড়ে যাই কী করে?' 'ওকে কোথাও লুকিয়ে রাখব, আর আমি সুন্দরীর রূপ ধরব, তুমিই আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবে।'

১৩। নেকড়ে ইয়েলেনা সুন্দরীর রূপ নিল, রাজকুমার ইভান তাকে রাজা কুস্মানের কাছে নিয়ে এলো। রাজা খুশি হয়ে ইভানকে লাগামসুদ্ধ সোনার কেশরওয়ালা ঘোড়া উপহার দিল।

১৪। রাজা কুস্মান সুন্দরীকে তার প্রাসাদ দেখাতে থাকে, এমন সময় সে যেমন নেকড়ে ছিল তেমনি নেকড়ে বনে গিয়ে জানলা দিয়ে এক লাফ। ছাইরঙা নেকড়ে তারপর দৌড়ে গিয়ে রাজকুমার ইভান ও ইয়েলেনা সুন্দরীর নাগাল ধরল, তারপর তারা চলল রাজা আফ্রোনের কাছে।

১৫। 'কী নিয়ে অত ভাবছ ইভান?' — ছাইরঙা নেকড়ে আবার জিজ্ঞেস করে। 'সোনার কেশরওয়ালা ঘোড়াকে ছেড়ে দিতে, আগুনেরঙা পাখির বদলে তাকে দিতে মন চাইছে না।' তাই নেকড়ে সোনার কেশরওয়ালা ঘোড়ার রূপ নিল, আর রাজকুমার তাকে রাজা আফ্রোনের কাছে নিয়ে এলো। রাজা আগুনেরঙা পাখিসুদ্ধ সোনার খাঁচা দিয়ে দিল।

১৬। রাজা আফ্রোন সবে ভেটপাওয়া ঘোড়াটার ওপর চেপে বসতে যাবে — অমনি সে যেমন নেকড়ে ছিল তেমনি নেকড়ে হয়ে গেল। রাজা তো ভয়ে কাঠ হয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই আছড়ে পড়ে গেল।

১৭। ছাইরঙা নেকড়ে রাজকুমার ইভানের নাগাল ধরল, বলল: 'এবারে বিদায়, আমার আর আগে যাওয়া বারণ।' রাজকুমার ইভান ঘোড়া থেকে নামল, তিনবার ভুঁয়ে মাথা নুইয়ে ছাইরঙা নেকড়েকে সেলাম করল আর ধন্যবাদ জানাল।

১৮। রাজকুমার ইভান সোনার কেশরওয়ালা ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরল, বাবার জন্য নিয়ে এলো আগুনেরঙা পাখি, আর নিজের জন্য কনে — ইয়েলেনা সুন্দরী। রাজকুমার ইভান তাকে বিয়ে করল, তারপর ওরা সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

পাথর-খুঁড়িয়ের কাহিনী

ডায়াফিল্ম স্টুডিওর নতুন স্লাইড ফিল্ম 'পাথর-খুঁড়িয়ের কাহিনী'। তাজিক রূপকথা অবলম্বনে এটি লিখেছেন র. কুশনেরোভিচ, ছবি এঁকেছেন শিল্পী আ. ভিনোকুরভ আর ল. শ্ভার্ৎসমান।

১) একদিন পাথর-খুঁড়িয়ে তার খাদে কাজ করছে, হঠাৎ শোনে হরকরারা চ্যাঁচাচ্ছে: 'দণ্ডবৎ করো, দণ্ডবৎ!'

২) পরক্ষণেই দেখা গেল শাদা হাতি, তার পিঠে রাশভারী রাজা। হাঁটু গেড়ে বসে পাথর-খুঁড়িয়ে ভাবে, 'রাজা আমায় নজরই করছে না। দণ্ডবৎ করছি তাহলে হাতিকেই...'

৩) '...হাতিও আমার চেয়ে সুখে আছে। হাতি হতে পারলেও হত।' ভাবতে না ভাবতেই সে হয়ে গেল হাতি। কী তার গজেন্দ্রগমন!

৪) হঠাৎ রাজার হাত থেকে পাথর-খুঁড়িয়ে-হাতির পিঠে পড়ল গরম চায়ের পেয়ালা। ভাবলে, 'রাজা হওয়াই তাহলে ভালো।'

৫) ... অমনি শাদা হাতির পিঠে রাজা হয়ে বসল সে। কত চা খাবে খাও, জাঁক করবে করো। ভারি সে খুশি...

৬) শুধু কী বিচ্ছিরি, সূর্য এসে সোজা বিঁধছে চোখে। ভাবলে, 'আমার চেয়ে সূর্যের জোর বেশি। আমি তাহলে সূর্য হব।'

৭) অমনি নতুন একটা সূর্য দেখা গেল আকাশে। তার আগুনে কিরণ আছড়ে পড়ল পৃথিবীতে। কিন্তু কাঠফাটা পৃথিবীর ওপর...

৮) ...উঠল ভাপ, ঘন হয়ে উঠল তা মেঘে। কালো মেঘে ঢাকা পড়ল সূর্য। ক্ষেপে উঠল সে। 'মেঘ হতে চাই!'

৯) অমনি পাথর-খুঁড়িয়ে-মেঘ ছাড়িয়ে পড়ল আকাশে। কিন্তু কে তাকে তাড়াচ্ছে? ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে? ঝড়! 'বটে, আমিও ঝড় হব!'

১০) 'হব-ও-ও-ও!' অমনি ঝড় হয়ে পাথর-খুঁড়িয়ে চলল শনশনিয়ে, টুপি খসিয়ে নেয় লোকের মাথা থেকে, উড়িয়ে দেয় ঘরের চালা।
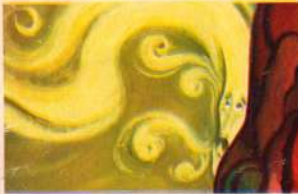
১১) হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল ঝড়। 'হব-ও-ও-ও!' বলে গোঁ-গোঁ করলে ঝড়, কিন্তু ঝড় তখন আর নেই...

১২) এবার সে পাহাড়। মাথা তার উঠেছে মেঘে, পায়ের কাছে লোক জনের কাণ্ড-কারখানা মনে হয় কী তুচ্ছ।

১৩) কিন্তু লম্বা হাতে গাঁতি ধরা একটা মানুষকে সে খেয়াল করে নি। হঠাৎ পাথর-খুঁড়িয়ে পাহাড়ের বুকে বিঁধল ধারালো ফলা...

১৪) 'মানুষের জোরই সবচেয়ে বেশি!' ককিয়ে উঠল পাহাড়, 'মানুষ হতে চাই!' ফের তার খাদে গিয়ে কাজ শুরু করল পাথর-খুঁড়িয়ে।

১৫) ... এই সময় ছুটতে ছুটতে আসে হরকরারা, হাঁকে, 'দণ্ডবৎ করো, দণ্ডবৎ!' কিন্তু পাথর-খুঁড়িয়ে-হাতি-রাজা-সূর্য-মেঘ-ঝড়-পাহাড় ঠিক করলে, 'না, করব না।'

১৬) এবং করলে না। কেউ তাকে দণ্ডবৎ করাতে পারে না। কেননা মানুষ নত হয় অপরের দাপটে নয়, নিজেরই দুর্বলতায়।

কথাকিনী

আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরেও লক্ষ লক্ষ লোক জানে তাতিয়ানা মাভরিনার নাম। তাঁর সহাস্য চিত্রণে অনেক বই আনন্দ দিয়েছে ছোটো-বড়ো সবাইকেই। সে এক অসাধারণ জগৎ। রুশী লোককাহিনী, চিরায়ত কথার জগৎ। তাঁর স্বকীয় মাভরিনা-শৈলীতে আঁকা হলেও কাহিনীগুলি ঠিক তাই, যেভাবে তাদের দেখেছিলেন লোককথার অনামা স্রষ্টা ও সাহিত্যিকেরা, জাতীয় উপাদান যাঁদের ভিত্তি।

তাতিয়ানা মাভরিনার জন্ম নিজনি নভগোরদে (বর্তমানে গর্কি শহর) শিক্ষক পরিবারে। থিয়েটার ছিল পরিবারটির নেশা। পৌর প্রশাসকের অনাড়ম্বর বাসায় মঞ্চস্থ হত নাটক। যা করবার সবই করে নিতে হত নিজেদের। পুশকিনের 'জার সালতান'-এর মঞ্চরূপের দৃশ্যপট রচনায় প্রথম নিজের শক্তি পরীক্ষা করেন ভবিষ্যৎ শিল্পী।

তারপর চলল শিক্ষা, রুশী লৌকিক কারুশিল্প, গ্রাম্য স্থাপত্য, সাংসারিক সামগ্রীর অধ্যয়ন। এই অধ্যয়ন থেকেই জীবন্ত, যেন তৎক্ষণাৎ আঁকা ছবিগুলোয় সহজে আসে জাতীয় উপাদান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপণ্ডিং সদস্য আ. সিদোরভ রুশ শিল্পের একজন বড়ো সমঝদার। মাভরিনাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে তিনি বলেন, 'মাভরিনার বই শিশুদের খেলাতে আর বড়োদের ভাবাতে পারে। দ্বিতীয় এমন কোনো শিল্পী আমাদের ছিল না এবং নেই। রুশী রেখাচিত্র গড়ে উঠেছে সুস্পষ্ট রৈখিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। আর মাভরিনা হলেন 'কথাকিনী' শিল্পী, কাহিনী অবলম্বনে যাঁরা আঁকেন তাঁদের কারো মতোই তিনি নন। তিনি সহজে এবং অনায়াসে প্রবেশ করেছেন রুশী লৌকিক শিল্পে। নিজেই তিনি লৌকিক কাব্যের চারণ।'

এ পাতাগুলোয় আমাদের ছোটো পাঠকেরা পাবে তাতিয়ানা মাভরিনার একটি কাহিনী।

সূর্যি, শশীকলা আর দাঁড়কাক

রুশী লোককথা এটি। তাতিয়ানা মাভরিনার আঁকা ছবিতে 'ডায়াফিল্ম' স্টুডিও এটি নিয়ে একটি ফিল্ম-স্ট্রিপ তুলেছে ছোটোদের জন্যে।

বুড়ো-বুড়ির তিনটি মেয়ে। একদিন বুড়ো গোলাঘরে গেল খুদ আনতে। খেয়াল করে নি যে বস্তায় ফুটো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সব খুদ পড়ে গেল। বুড়ি বললে, 'যাও কুড়িয়ে আনো।' কুড়োয়, কুড়োয় — একেবারে নেতিয়ে পড়ল বুড়ো। বলে, 'ইস, সূর্যি যদি একটু গা গরম করে দেয়, শশীকলা আলো দেয়, দাঁড়কাক দানা খুঁটে তুলতে সাহায্য করে, তাহলে মেয়েদের বিয়ে দেব ওদের সঙ্গে।'

১) বলতে না বলতেই গা গরম করে দিলে সূর্যি, আলো দিলে শশীকলা আর দাঁড়কাক উড়ে এসে একেবারে শেষ দানাটি পর্যন্ত কুড়িয়ে দিলে।

৩) সূর্যি তাকে নিয়ে গেল। আর মেজোটিকে নিলে শশীকলা, ছোটোটিকে দাঁড়কাক।

বুড়ো-বুড়ি রইল একা।

২) বাড়ি ফিরে বুড়ো মেয়েদের বললে 'সাজগোজ করে অলিন্দে যাও। বরেরা আছে সেখানে।' গেল বড়ো মেয়ে...

৪) মেয়েদের জন্যে মন কেমন করল বুড়োর, ঠিক করল দেখতে যাবে। অনেক সে হাঁটল। ক্ষয়ে গেল জুতো, শেষ পর্যন্ত পেঁছল সূর্যের বাড়িতে। 'কী খাবে বাবা?' — জিজ্ঞেস করলে জামাই।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

৫) 'তা চাপাটি খেলে মন্দ হয় না।' বড়ো মেয়ে ময়দা মাখলে আর সূর্যি মেঝের ওপর বসে বললে, 'নাও বউ, মাথার ওপরে ভাজো।' তাই ভাজা হল... পেট ভরে বুড়ো খেল...

৬) বিদায় নিয়ে গেল শশীকলার কাছে। মেজো মেয়ে আর জামাই মানি্য করে তাকে ঘরে তুলল। 'কী তোমার ইচ্ছে বাবা?' 'একটু স্নান করতে পারলে হত!' 'এক্ষুনি জল গরম করছি...'

৭) 'স্নান করব কী করে? গোসলখানা যে অন্ধকার।' শশীকলা বলে, 'এক্ষুনি আলো হয়ে যাবে।' ফাটলে আঙুল ঢোকাতেই আলো হয়ে গেল। সাধ মিটিয়ে স্নান করলে বুড়ো।

৮) সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেল দাঁড়কাকের কাছে। ছোটো জামাইও খুশি হয়ে উঠল। ভেবে পায় না কী খাওয়াবে, কোথায় বসাবে। বুড়ো বললে 'বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমায় বরং শুতে দাও।'

৯) মুরগী ঘরে নিয়ে গেল তাকে। 'দাঁড়ে উঠে পড়ো বাবা, এক্ষুনি সবাই ঘুমিয়ে পড়ব।' দাঁড়কাক বুড়োকে পাখা দিয়ে ঢাকল, দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। রাত কাটিয়ে বুড়ো বিদায় নিলে...

১০) বাড়ি যাবার জন্যে খুব তার তাড়া, ছুটে ছুটে যায়। বাড়ি ফিরতে বুড়ি শুধোল, 'কেমন আছে আমাদের মেয়েরা?' আর বুড়ো বলে, 'তাড়াতাড়ি ময়দা মাখো, চাপাটি খাব।'

১১) কিন্তু চুল্লি জ্বালাতে বললে না। বসল মেঝের ওপর, তাওয়া চাপাতে বললে মাথায়। চাপাটি কিন্তু তৈরি হল না, সে'কতে হল চুল্লিতেই।

১২) খেয়ে দেয়ে বুড়ো গোসলখানায় পাঠালে বৌকে। 'অন্ধকার যে।' 'ভাবনা নেই, আলো হয়ে যাবে', আশ্বাস দিলে বুড়ো, 'তুমি স্নান করে নাও প্রথমে...

১৩) আমি তোমায় আলো দেব।' ফাটলে আঙুল ঢোকাল বুড়ো, গোসলখানা কিন্তু রয়ে গেল অন্ধকারই। লণ্ঠন জ্বালিয়েই স্নান সারতে হল...

১৪) বিছানা পাততে শুরু করল বুড়ি, ও দিকে বুড়ো বলে, 'মুরগীগুলোর সঙ্গে দাঁড়ে ঘুমোব।' রেগে উঠল বুড়ি...

১৫) থরেই রইল। আর বুড়ো গেল মুরগী ঘরে, দাঁড়ে উঠে ঢুলতে লাগল। আর ঢুলতেই — গেল পড়ে। ফুলে উঠল কপাল...

১৬) ছিঁড়ে গেল প্যাণ্ট, হকচকিয়ে উঠল মুরগীরা। আহ্‌-উহ্‌ করে গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরেই ঢুকল বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে।

নির্ভীক ইয়াত্তো আর তার বোন তেয়ুনে'র কাহিনী

এ কাহিনী সেই চূড়ান্ত উত্তরের যেখানে স্বর্ণ-শৃঙ্গ হরিণের স্লেজ'তে করে আকাশ পাড়ি দেয় সদাশিব সূর্য, যেখানে থাকে ডাইনী তুষার-ঝঞ্ঝা, মেরু রাত্রির অন্ধকার যার দখলে। এই নিষ্করুণ অঞ্চলের অধিবাসীদের আছে নিজস্ব কাহিনী আর কিংবদন্তী, তাতে প্রকৃতির হিংস্র শক্তি পরাজিত হয় নির্ভীক ক্ষিপ্র-বুদ্ধি বীরেদের কাছে। রুশ ফেডারেশনের উত্তরের একটি জাতি নেনেৎসদের কাহিনী অবলম্বনে শিশু-সাহিত্যিকা জান্না ভিতেনজন লিখেছেন খোকা ইয়াত্তো আর খুকি তেয়ুনে'র গল্প। আর তার ফিল্ম স্ট্রিপের জন্যে ছবি এঁকেছেন শিল্পী ল. আরিস্তভ।

১) সে অনেক দিনের কথা। তুহিন সাগরের তীরে ছিল হরিণ-ছালের ছাউনি। থাকত তাতে ছেলে ইয়াত্তো আর মেয়ে তেয়ুনেকে নিয়ে এক কাঙালিনী। সংসারের সব কাজই করত মা।

২) শিকারে যেত, জল আনত, কাঠ কুড়াত তুন্দ্রায়। একদিন অসুখে পড়ল মা, ছেলেকে বললে কাঠ আনতে। ইয়াত্তো কিন্তু হরিণের চামড়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল, যেন কথা কানেই যায় নি।

৩) 'যা খুকি, কাঠ নিয়ে আয়। আগুন নিবে গেলে তুষার-ঝঞ্ঝা এসে হানা দেবে।' 'সময় নেই আমার,' বলে তেয়ুনে তার বেণীতে পুঁতি পরাতে লাগল।

৪) তুষার-ঝঞ্ঝা ছিল কিন্তু কাছেই ... আগুনের ফুলকি এসে পড়ল তার বরফে বোনা কোর্টে — প্রকাণ্ড এক ফুটো হয়ে গেল তাতে। হিংস্র তুষার-ঝঞ্ঝার আগুনে খুব ভয়।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

সীমানা

মস্কোর 'ময়ুলৎফিল্ম' স্টুডিও থেকে মুক্তি পেয়েছে রুশী কাহিনীর ঐতিহ্য অবলম্বনে আঁকা ছবির ফিল্ম 'সীমানা'। তার চিত্রনাট্যকার ইউ. কিরশন, পরিচালক ভ. কতেওনোচকিন ও শিল্পী-প্রযোজক স. রুসাকভ। এ পাতার ছবিগুলিও তাঁরই আঁকা।

১) সৈন্যদলে কাজের শেষে বাড়ি ফিরছে সেপাই কুজমা। কোথাও পাহাড় কোথাও ঢালু, কোথাও মাঠ কোথাও বন, কোথাও সড়ক কোথাও হাঁটাপথ। যায় আর গান গায়, আনন্দ করে। এল বাড়িতে...

২) ভারি বিপদ! গাঁয়ের লোকেরা ঘিরে ধরল কুজমাকে, হায়-হায় করলে, 'নাগ আর রাজা আমাদের সর্বনাশ করেছে। ভেট দেই যত, দুয়ের খাঁই তত। বলে, আরো দে।'

৩) আর বলতে না বলতেই উড়ে আসে গাঁরনিচ নাগ। হৈচৈ করে উঠল সবাই, 'আস্তো থাকতে থাকতে পালাও বাপুরা!' বোঝাই যায়, বিপদে ভয় পাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। সেপাই ওদের আটকাল, সবাইকে বলল লুকিয়ে থাকতে, নিজে রইল বাইরে।

৪) নাগ বলে, 'ভেট তৈরি?' 'না, রাজা সব নিয়ে গেছে।' 'নিল মানে? এ গ্রাম তো আমার!' 'রাজা বলছে ওর। ওই তো নিজেই আসছে।'

৫) ফিরে তাকাল নাগ — সত্যিই! গর্জে উঠল, 'দেখাব ওকে, টের পাবে!'

৬) দেখাত হয়তো, তবে রাজাও সহজ পাত্র নয়। লড়তে এসেছে একলা নয়, সৈন্যসামন্ত নিয়ে। লুটের খাঁই, লাগল লড়াই, ঠেঙাড়ে আর ডাকাতে।

৭) লড়াই চলল অনেকক্ষণ, কেউ আর জেতে না। জোরাজুরি ফুরিয়ে এল। বুদ্ধি করে সেপাই বললে, 'যে সবচেয়ে জোরে শিস দেবে, তারই জিত।'

৮) বেশ। শিস দিলে নাগ। কী তার জোর। কুজমা তাকে বাহবা দিয়েও সাবধান করে দিলে, 'তবে রাজার শিসে নাগ, চোখ কিন্তু ঠিকরে আসবে। এসো বরং বেঁধে রাখি।'

৯) বেঁধে রাখলে। আর 'শিস'টা হল মুগুর-পেটা। কোনো রকমে জ্ঞান ফিরে নাগ শুধোয়, 'তা কার জোর বেশি সেপাই?' 'দুজনেই জোরদার। সমান সমান ভাগ করতে হয়।' 'তা কি চলে?'

১০) 'সারা দুনিয়া বরাবর হালের দাগ দেব। অর্ধেকটা তোমার, অর্ধেকটা ওর। শুধু হাল বানাবার লোহা নেই। সব লোহা গেছে রাজার তরোয়ালে।' রেগে উঠল রাজা, 'নেই মানে?! এই সৈন্যরা, হাতিয়ার ফেলো!' ফেলল। টায়ে-টোয়ে কুলিয়ে গেল। পেটাতে লাগল।

১১) পিটিয়ে বানাল এক ঘাট-মনী হাল। সেপাই তা জুতলে নাগের লেজের সঙ্গে। রাজা হল চালক। আর রাজার সেনাপতিকে গাড়িঘোড়া নিয়ে সেপাই পাঠাল আগে ভাগে হলরেখার শেষে সমুদ্রের কাছে ভোজের তোড়জোর করতে। চলে গেল সেনাপতি!..

১২) কতদিন হাল টানা চলল কে জানে, মাটি ফুরিয়ে গিয়ে এসে পেঁছিল সমুদ্রের কাছে। তীরে সেনাপতির কাছে খানা-পিনা সব তৈরি। হাল খসাতে চাইল নাগ, বজ্র আঁটুনি, খসাতে আর পারে না। কুজমা তার কাছে গেল যেন সাহায্য করতে। বললে, 'খুলছে না, উপোস দিয়ে লেজ শুকিয়ে গেছে। একটু ভিজিয়ে নেবে, নাকি ভোজ খাবে?'

১৩) 'এখন ভোজ, ভেজানো যাবে পরে। এখন খেতেও চাই, পান করতেও চাই।' হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জন খাবারের ওপর, মদও বাদ গেল না। রাজা এক গেলাস খায় তো নাগ এক পিপে। রাজা দ্বিতীয় গেলাস, নাগ একসঙ্গে দুই পিপে। মেজাজ একেবারে শরীফ। ডেকে বললে, 'এই সেপাই, তোর জন্যে এক পাত্র বিয়ার!'

১৪) কুজমা কিন্তু যায় না। বলে, 'মদের সঙ্গে খাবার মতো ডিমভরা মাছ নেই তোমাদের টেবিলে। আগে তোমার সাগরে একটা মাছ ধরি, কেমন?' 'ধর।' দু'জনেই সায় দিলে যে যার মতো, আবার একসঙ্গেও।

১৫) নাগের ধৃষ্টতায় রাজা স্তম্ভিত, রাজার ধৃষ্টতায় নাগ। দু'জনেই চেঁচায়, 'সমুদ্র আমার, মাছও আমার!' এ ব্যাপারেও উপায় বাতলালে কুজমা, 'আরো ভাগাভাগি করা দরকার। সমুদ্রটাও দুভাগ করতে হয়।' টেবিল থেকে উঠে এল নাগ, রাজা ধরলে হাল। 'ভাগাভাগিই হোক!' বাস, ডুবে মরল।

১৬) আর সেপাই ফিরল ঘরে। গাঁয়ের লোক সবাই ঘিরে ধরল তাকে। আনন্দ আর ধরে না। কুজমাও খুশি বৈকি, হেসে বলে, 'দ্যাখো, তোমরা পালাতে চাইছিলে। জমি আমাদের, আমাদেরই তাতে থাকার কথা!'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

সাদকো

রুশ লোককাহিনী ও গাথার নায়ক সে। কিংবদন্তিতে বলে, থাকত সে প্রাচীন নভগরদ শহরে, তারযন্ত্র বাজানোতে তার খুব নাম। রুশী কবি, সুরকার, চিত্রকরদের তার একটা কাহিনী বহুকাল থেকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে — নভগরদের বাজিয়ে সাগরের রাজাকে জয় করল কিভাবে। এই কাহিনী অবলম্বনে শিল্পী ক. সার্পোগনের আঁকা ছবিতে একটি ফিল্ম বেরিয়েছে 'ডায়াফিল্ম' স্টুডিও থেকে।

১) সাদকো ছিল গরিব বাজনদার। তারযন্ত্রটি ছাড়া আর কোনো সম্পত্তি ছিল না তার। একবার ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তার, ইল্‌মেন হ্রদের তীরে গিয়ে শ্বেতপাথরে বসে বাজাতে লাগল।

২) হঠাৎ দেখা দিল সাগরের রাজা। 'তোর বাজনায় আমি তুষ্ট হয়েছি সাদকো। কী পুরস্কার দিই তোকে? শোন বলি, নভগরদের সদাগরদের কাছে গিয়ে বাজি ধর: ইল্‌মেন হ্রদে সোনালী পাখনার মাছ আছে।'

৩) সদাগরদের ভোজে বাজাবার জন্যে সাদকোর ডাক পড়তে সে বললে: 'ইল্‌মেন হ্রদে সোনালী পাখনার মাছ না থাকলে আমার গর্দান যাবে। থাকলে সওদা সমেত তোমাদের সমস্ত দোকান-পাট আমার।'

৪) রাজি হল সদাগররা। তক্ষুনি রেশমের জাল বুনে ফেলা হল হ্রদে, টেনে তুলল সোনালী পাখনার মাছ। দোকান-পাট দিয়ে দিতে হল সদাগরদের।

৫) সাদকো হয়ে দাঁড়াল নভগরদের সবচেয়ে ধনী সদাগর। নানান জিনিস বেচতে শুরু করল সে, প্রচুর লাভ হতে শুরু করল।

৬) যখন অগুনতি টাকা হল, তখন সাদকো তিরিশটি জাহাজ বোঝাই করল নভগরদের মাল দিয়ে, বাহিনী গড়ল বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে...

৭) ...জাহাজ ভাসাল প্রথমে ভলখোভ নদীতে, সেখান থেকে লাদোগা হ্রদ দিয়ে নেভা নদীতে, তারপর নীল সমুদ্রে।

৮) আর সমুদ্রে আবহাওয়া হল খারাপ, আছড়ে পড়ে ঢেউ, পাল ছিঁড়ে যায়, ভেঙে পড়ে জাহাজ।

৯) নিজের সাহসী সঙ্গীদলকে সাদকো বলে, 'দেখছি সমুদ্রের রাজা ভেট চায়। দান ফেলব, যার ভাগ্যে পড়বে তাকে যেতে হবে সাগরের তলে।'

১০) দান পড়ল সাদকোরই ভাগ্যে। জলে এক কাঠের তক্তা ফেলে তাতে নামল সাদকো। হঠাৎ শান্ত হয়ে এল সাগর, জাহাজগুলো দিব্যি ভেসে চলল ঢেউয়ে।

১১) তক্তায় ঘুমিয়ে পড়ল সাদকো, ঘুম ভাঙল সাগরের তলে। দেখে, নীল সাগরে শ্বেতপাথরের পুরী। আর সেখানে সাগরের রাজা।

১২) রাজা তাকে বললে, 'তোর বাজনাটা বাজা সাদকো।' তারে ঝংকার দিতেই গোটা সাগর-রাজ্য নাচতে শুরু করে দিলে, রাজাও যোগ দিলে তাতে।

১৩) তিন দিন বাজায় সাদকো, তিন দিন নাচে নীল সাগর, আর নাচে সাগরের ওপরে জাহাজগুলো, ছটকে-ছিটকে পড়ে। তা দেখে বাজনার তার ছিঁড়ে ফেলল সাদকো।

১৪) সাগরের রাজা বললে, 'ধন্যবাদ! আমার যেকোনো কন্যাকে বেছে নে বৌ হিশেবে।' এল তিনশ' সাগরের কন্যা।

১৫) সুন্দরী চের্নাভাকে পছন্দ করলে সাদকো। সারা পুরী জুড়ে সোরগোল তুলে চলল বিয়ের ভোজ। সাগরতলে ঘুমিয়ে পড়ল সাদকো...

১৬) ঘুম ভাঙল নভগরদে, অচেনা এক নদীর খাড়াই পাড়ে। সেখানেই সাগর পাড়ি দিয়ে ফিরেছে তার সঙ্গীদল। সাদকো বেঁচে আছে দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল তারা।

সেই থেকে নদীটার নাম চের্নাভা।

রেশমী তুলিকা

সাইবেরিয়ার বাসিন্দা বহু জাতি আর উপজাতির মধ্যে আলতাইবাসীরা অন্যতম। পশুপালক ও শিকারী এই লোকেদের বাসস্থান হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য আলতাই এলাকা যেখানে বয়ে চলেছে সাইবেরীয় মহানদী ওবি-র দু'টি উৎস — বিয়া আর কাতুন। এতদঞ্চলের গভীর অরণ্যে আছে অনেক জন্তু-জানোয়ার, আর পাহাড়ী নদীনালায় প্রচুর মাছ। আলতাইবাসীদের রূপকথার নায়করা হল শিকারী আর জেলে। এখানে এরূপই একটি রূপকথা ছাপানো হল।

ছবি এ'কেছেন ওলগা ও ভ্লাদিমির বাই।

১. এক যে ছিল মেয়ে। তার নামটি ছিল তর্কো-চাচাক — অর্থাৎ রেশমী তুলিকা। তার চোখদুটো ছিল মুক্তার মতো, আর ভুরু যেন বাঁকা রামধনু। একদিন অসুখে পড়ল ওর বুড়ো বাপ। মা মেয়েকে ডেকে বলল: 'যা তো তর্কো-চাচাক, গুণী ডাইনকে ডেকে নিয়ে আয়।'

২. ডাইন বসে ছিল চৌকাঠে। তার ভুরুগুলো ছিল ঠিক শেওলার মতো, তার ইয়া লম্বা দাড়ি। রেশমী তুলিকাকে দেখেই সে মনে মনে এক ফন্দি আঁটল: একে চুরি করতেই হবে। মেয়েটির অনুরোধ শুনে বললে 'ঠিক আছে, কাল ভোরে আসব।'

৩. ডাইন রোগীকে দেখে সে বলল: 'রেশমী তুলিকাকে মেরে ফেলতে হবে। ওর রূপের আড়ালে ভূত লুকিয়ে আছে। মেয়েটি যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন গরুর কোন বাচ্চা হবে না, ছোট ছেলেমেয়েরা মরতে থাকবে, বুড়োর অসুখ সারবে না। তর্কো-চাচাককে একটি কাঠের পিপেতে ভরে নদীতে ফেলে দাও।'

৪. ডাইন ফিরে চাকরদের বলল, — তোরা সবাই নদীর পারে যা তো। জল আমার জন্য বড় একটি পিপে ভাসিয়ে নিয়ে আসবে। ওটা তুলে এনে এখানে রাখবি আর নিজেরা বনে চলে যাবি। কান্না-চিৎকার শুনেও তিনদিনের আগে আসবি না।

৫. গ্রামের লোকেরা পুরো সাতটি দিন ভেবেও তারা কিছুতেই ডাইনের আদেশ পালন করতে পারল না। পুরো সাতটি দিন কাঁদল রেশমী তুলিকা। আট দিনের দিন তাকে বড় একটি পিপেতে ঢুকিয়ে ন'টি লোহার পাত দিয়ে বেঁধে পিপের তলাটিতে তামার পেরেক মেরে খরস্রোতা এক নদীতে ফেলে দেওয়া হল।

৬. আর সেদিন নদীতে মাছ ধরছিল অনাথ জেলে বালিক্‌চি। সে-ই প্রথম দেখতে পেল বড় পিপেটি, এবং ওটা তুলে নিয়ে গেল নিজের সবুজ ঝুপড়ীতে। কুড়ুল দিয়ে পিপের তলাটি ভাঙতেই সে দেখল মেয়েটিকে। বালিক্‌চি তো একেবারে থ, — কুড়ুল হাতে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

৭. রেশমী তুলিকা বালিক্‌চিকে বজ্জাত ডাইনের কথা বলল। জেলে মেয়েটিকে পিপে থেকে বের ক'রে ওতে একটি পাগলা কুকুর ঢুকিয়ে ফের নদীতে ফেলে দিল।

৮. ডাইনের চাকররা পিপেটি দেখেই তুলে নিয়ে গেল ডাইনের কাছে, তারপর চলে গেল বনে। কিছু দূর যেতে না যেতেই চাকরেরা শুনতে পেল চিৎকার। "বাঁচাও! বাঁচাও!" কিন্তু চাকরেরা আরও তাড়াতাড়ি, আরও দূরে ছুটে পালাল: সেটাই প্রভুর হুকুম।

৯. আর তর্কো-চাচাক এদিকে বাস করতে লাগল জেলের সবুজ ঝুপড়ীতে। বালিক্‌চি আর মাছ ধরতে যায় না, সে দিনরাত কেবল মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে থাকে। তখন তর্কো-চাচাক এক টুকরো বাকল নিয়ে ছুরি দিয়ে তাতে নিজের ছবি আঁকল এবং লাঠিতে ঝুলিয়ে সেটি নদীর তীরে পুঁতে রাখল।

১০. এরপর থেকে বালিক্‌চি প্রায়ই মাছ ধরতে যায়। একদিন সে পলকহীন চোখে বহুক্ষণ বাকলটির দিকে তাকিয়ে রইল এবং ছিপের কথা একেবারে ভুলেই গেল। হঠাৎ বিরাট একটি মাছ সুতোয় টান দিতেই ছিপটি তার হাত থেকে খসে পড়ে লাঠিতে লাগতেই বাকলটি জলে পড়ে ভাটির দিকে ভেসে চলল।

১১. যে এই বাকল পাবে, সে-ই এখানে আসবে! তোমাকে মেরে ফেলবে, আর আমাকে নিয়ে যাবে। পালাও বালিক্‌চি পালাও! তুমি ছাগলের চামড়া দিয়ে একটি ওভারকোট সেলাই ক'রে লোমগুলো বাইরের দিকে রেখে ওটা পরবে এবং নীল ষাঁড়ের পিঠে বসে নদীর পার ধরে আমায় খুঁজতে যাবে।

১২. বাকলটি গেল বাদ্‌শা কারা খানা। সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখেই সে নদীর তীর বরাবর ঘোড়া ছুটাল। রেশমী তুলিকা সবুজ ঝুপড়িতে ছিল একা। সে কাঁদলও না, হাসলও না, নিরবে গিয়ে বসল ঘোড়ার পিঠে, মুক্তাখচিত জিনে।

১৩. কারা খানের প্রাসাদে পুরো তিনটি বছর কেউ তর্কো-চাচাকের মুখে একটা কথাও শুনল না। পুরো তিনটি বছর কেউ তার হাসিও দেখল না। তিন বছর সে কাঁদল না, তিন বছর সে হাসল না।

১৪. হঠাৎ একদিন সকালে তর্কো-চাচাক হাততালি দিয়ে আনন্দে হেসে উঠল। রাস্তা দিয়ে আসছিল নীল এক ষাঁড়, আর ষাঁড়ের পিঠে বসে ছিল ছাগলের চামড়ার ওভারকোট গায়ে এক ছোকরা। 'কী গো সুন্দরী, তুমি ওকে দেখে হাসছ বুঝি? কারা খান বলল ওভাবে আমিও তো তোমাকে হাসাতে পারি!

১৫. কারা খান বালিক্‌চিকে ষাঁড়ের পিঠ থেকে নামিয়ে তার ওভারকোটটি খুলে নিল। বাঁ পা'টি লোহার রেকাবের উপর রেখে কারা খান ডান পা'টি জিনের অপর পাশে নিয়ে যাওয়ার আগেই ষাঁড় দিল ছুট এবং তাকে টেনে নিয়ে গেল মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে। কারা খানের সমস্ত প্রজারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল।

১৬. আর রেশমী তুলিকা অনাথ বালিক্‌চির ডান হাতটি ধরে ফিরে গেল সবুজ ঝুপড়িতে। তারপর থেকে তারা দু'জনে সুখেশান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

অ্যাম্বারের পুরী

জানো তো, বল্টিক সাগরকে মাঝে মাঝে বলা হয় অ্যাম্বারের সাগর। ঢেউয়ে তার তীরে ভেসে আসে সোনালী-হলুদ অ্যাম্বারের সুন্দর সুন্দর টুকরো—বহুকাল আগেকার শিলীভূত রজন বা তৈলস্ফটিক। বল্টিক লোকেদের মধ্যে অ্যাম্বার নিয়ে কাহিনী আছে অনেক। অ্যাম্বারের পুরী, সাগরের রাজকন্যে ইউরাতে আর নির্ভীক জেলে কাস্তিতিসের এই লিথুয়ানীয় কাহিনীটি তার একটি।

'সয়ুজমুল্টফিল্ম' স্টুডিও থেকে এ নিয়ে মুক্তি পেয়েছে একটি কার্টুন ফিল্ম। প্রযোজক আ. স্নেজকো-ব্লৎস্কায়া। আর আমাদের পত্রিকার জন্যে ছবি এঁকে দিয়েছেন ফিল্মটির শিল্পী গ্রাজিনা ব্রাশিশকিতে।

১) কিশোর জেলে কাস্তিতিস যাবে সাগরে। মা যোতুলে তাকে রঙচঙে এক কোমরবন্ধ দিয়ে বললে, 'এটা আমি নিজে বুনেছি, বিপদ-আপদ থেকে তোকে বাঁচাবে।'

২) নৌকো বেয়ে চলেছে কাস্তিতিস, হঠাৎ শোনে অপরূপ এক গান। জানত না সে, সাগরের রাজকন্যে ইউরাতে তার অ্যাম্বারের পুরী থেকে বেরিয়ে এসে বজ্র ও বিদ্যুতের অধিপতি পেরকুনাসের বন্দনা গাইছে।

৩) নৌকোয় কিশোর জেলেকে দেখতে পেয়ে ইউরাতে চুপি চুপি সাঁতরে গেল তার কাছে... আটকে গেল জালে। জাল টেনে তুলল কাস্তিতিস, দেখে তাতে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে।

৪) 'কে তুমি?' অবাক হল কাস্তিতিস। 'আমি ইউরাতে, সাগরের রাজকন্যে।' জাল থেকে বার করে এনে কাস্তিতিস ইউরাতেকে বসাল নৌকোয়। রুদ্র পেরকুনাস তা দেখে রেগে হানলে তার বিদ্যুৎ। নৌকো উলটিয়ে গিয়ে ডুবতে থাকল কাস্তিতিস।

৫) ওদিকে তীরে মোতুলে জিজ্ঞেস করে সিন্ধুচিলদের, 'ধবল-ডানা সিন্ধুচিল, আমার কাস্তিতিসকে দেখেছো কি তোমরা?' পাখিরা বললে, 'না, দেখেছি কেবল তার ভাঙা নৌকো।' কাঁদতে লাগল মোতুলে...

৬) ওদিকে গভীর সাগরতলে অ্যাম্বারের পুরীতে প্রাণহীন দেহে কাস্তিতিস পড়ে আছে। তাকে চুমু খেলে ইউরাতে, অমনি বেঁচে উঠল নওলকিশোর কাস্তিতিস।

৭) ইউরাতে বললে, 'আমায় পৃথিবীর কথা শোনাও-না কাস্তিতিস।' 'সেটা এখানকার মতো এত সুন্দর নয় রাজকন্যা, তবে বেশ ভালো জায়গা, গরম।' জেলের ছেলে শোনাল লোকজন, পাইনগাছ, পাখি-পাখালির কথা।

৮) হাততালি দিলে ইউরাতে, 'এই আমার ঝলঝলী মাছেরা, অতিথির মনোরঞ্জন করো, পৃথিবীর কথা যেন সে ভুলে যায়।' নাচ শুরু করলে মাছেরা, ঘুরপাক খেতে লাগল, ওদিকে ইউরাতে ভুলেই গেল যে কখন পেরকুনাসের বন্দনা গাওয়ার সময়।

৯) বুড়ি মাছ কাস্তিতিসের কানে কানে বললে, 'সিন্ধুচিলেরা ডেকে ডেকে বলছিল যে তোর মা বড় দুঃখ করছে।' লাফিয়ে উঠে কাস্তিতিস ছুটল দেউড়ির দিকে, সামুদ্রিক ঘোড়ায় জোতা ঝিনুকের দোলায় উঠে বসল: 'যাব পৃথিবীতে।'

১০) ইউরাতের ওপর রেগে গেল পেরকুনাস: 'অ্যাম্বারের পুরীতে তুই মানুষকে নিয়ে আসিস, এত তোর স্পর্ধা। বেশ তবে তোর পুরীই হোক তার কবর।' এই বলে বজ্রপাণি হানলে তার বিদ্যুতের তীর...

১১) গর্জে উঠল, ফুলে উঠল সাগর, খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রাজকন্যার অ্যাম্বার পুরী। ঢেউয়ের দোলায় দোলে ইউরাতে, কাস্তিতিসকে খোঁজে।

১২) তারপর তাকে দেখতে পেয়ে সাঁতরে সহ ধরে উঠে এল তীরে। বুড়ি মোতুলে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে... হঠাৎ মেঘের মধ্যে পেরকুনাসের আবির্ভাব। কাস্তিতিসকে দেখতে পেয়েই সে তীর ছুড়ল।

১৩) মায়ের হাতে বোনা কোমরবন্ধ বাঁচিয়ে দিল কাস্তিতিসকে। তীর বিঁধল ইউরাতের গায়ে। কাস্তিতিসের বাহুবন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সাগরের রাজকন্যা, শুধু তার হাতে রয়ে গেল রাজকন্যার অ্যাম্বারের মাকড়ী।

১৪) অনেক যুগ কেটে গেছে তারপরে, কিন্তু এখনো বল্টিক সাগর লিথুয়ানিয়ার তীরে নিয়ে এসে ফেলে ইউরাতের অ্যাম্বার পুরীর টুকরো। আজো পর্যন্ত তরুণেরা তাদের বান্ধবীদের উপহার দেয় অ্যাম্বারের মালা।

কার জন্যে মানুষের জন্ম

লেওন খাচাত্রিয়ানের ছবিতে মঙ্গোল রূপকথা

১. এক বৃদ্ধের তিন ছেলে। বড়ো দুই ভাই চালাক চতুর, আর ছোটো দাভাদোর্জিকে ভাবা হত বোকা। স্তেপে কারো টাকার থলি হারাল, ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলল সেটা অচেনা মানুষটাকে ফিরিয়ে দিতে। কারো ভেড়া এসে পড়ল তাদের ছাউনিতে, দাভাদোর্জি সারা স্তেপ চুড়ে বেড়ায় তাকে মালিকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। 'এমন বোকার সঙ্গে থাকতে চাই না' - দাদারা রেগে তাকে তাড়িয়ে দিল ছাউনি থেকে।

২. দূরের পথ ধরল দাভাদোর্জি, জ্ঞানী বুড়োর কাছে যেতে চায় একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নেবে। গেল সে পাশের খাঁয়ের রাজ্যে। দেখে সেখানে লোকেরা রোগা-পটকা, মনমরা, গরু-ভেড়া হিলহিলে। তারা বললে, 'এক মাস আমাদের নদী শুকিয়ে গেছে, সাহায্য করো আমাদের'। 'একটু সবুর করো, জ্ঞানী লোককে খুঁজছি, তাকে পেলে বলব তোমাদের বিপদের কথা' - বললে দাভাদোর্জি।

৩. সূর্যাস্তের সময় দাভাদোর্জি দেখে পাহাড়তলিতে ছাউনি। সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ি আর সুন্দরী এক কন্যে। দাভাদোর্জি নমস্কার জানালে তাদের। বুড়িও প্রতিনমস্কার করল, কিন্তু মেয়েটি না। মা বললে, 'ওর ওপর রাগ ক'রো না। ও অন্ধ, জীবনে ওর আলো নেই, সুখ নেই।' 'জ্ঞানীর কাছে বলব ওর কথা' - এই ভেবে চলল সে এগিয়ে। সাত দিনের দিন পৌঁছল সে পাহাড়ের গায়ে এক গুহার কাছে। জ্ঞানী বৃদ্ধ থাকত সেইখানে।
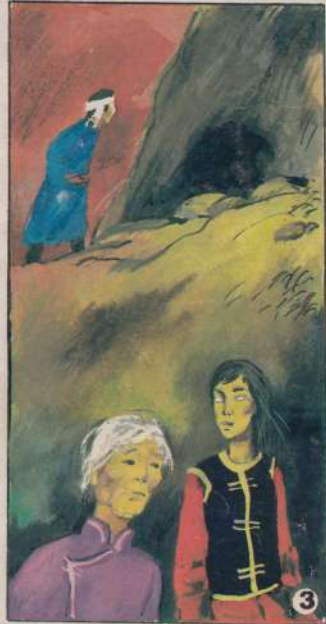
৪. বুড়ো শুধান, 'কোন দুঃখে এলে আমার কাছে?' দাভাদোর্জি বললে তাঁকে তেষ্টায় মরমর লোকেদের কথা, মেয়েটির কথা যার জীবনে আলো নেই, সুখ নেই। জ্ঞানী বললে, 'খাঁয়ের রাজ্যের লোকেরা যাক নদীর উৎসের কাছে। সেখানে দেখতে পাবে তাদের বাঁচার উপায়, আর অন্ধ সুন্দরীর চক্ষুদান হবে যখন তার বাঁ হাত ছোঁতে আসবে তার ভাবী স্বামী। কিন্তু তাড়াতাড়ি করো, তোমার সাহায্য পৌঁছনো চাই কাল সূর্যোদয়ের মধ্যে। নইলে সবই থাকবে আগের মতোই।'

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

৫. বুড়ো হাত নাড়তেই দাভাদোর্জির সামনে এসে দাঁড়াল এক ঘোড়া, তেমন ঘোড়া কেউ কখনো দেখে নি। বুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটি ছুটল স্তেপে। কেবল তখনই তার মনে পড়ল যে নিজের দুঃখের কথা বুড়োকে সে বলে নি। ভেবেছিল ফিরে গিয়ে শুধাবে, কিন্তু মনে হল, সূর্যোদয়ের আগে যদি সে বুড়োর পরামর্শ না জানাতে পারে, তাহলে মেয়েটি অন্ধ থেকে যাবে, অনেক লোক মারা যাবে তেষ্টায়।

৬. পাহাড়তলির ছাউনিতে এসে সে মাকে জানাল কেমন করে পরমাসুন্দরী মেয়ে তার ভালো হয়ে উঠবে। বুড়ি খুশি হয়ে উঠে বললে, 'ধন্যবাদ তোমায়। শুধু জানি না ওর কোন হাতটা বাঁ, কোনটা ডান।' 'এইটে বাঁ হাত' - এই বলে সুন্দরীর হাত ছুঁল সে। অমনি চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'দেখতে পাচ্ছি। দেখছি সূর্য, স্তেপ, নীল আকাশ। কী সুখ আমার!' মা আর মেয়ে জড়িয়ে ধরল দাভাদর্জিকে - জামাই, ভাবী স্বামী।

৭. কিন্তু দাভাদোর্জির বড়ো তাড়া। কনেকে তার তামাটে ঘোড়ায় চাপিয়ে সে ছুটল খাঁয়ের রাজ্যে। লোকে সেখানে পড়ে আছে মরণের অপেক্ষায়। বলে, 'উঠবার শক্তি আমাদের নেই।' তখন দাভাদোর্জি নিজেই ঘোড়া ছুটাল নদীর উৎসের দিকে। দেখে সেখানে বিরাট এক হাতি পড়ে আছে, আটকে রেখেছে গোটা নদী। তার গতর টেনে সরাতেই জল বইল খাঁয়ের রাজ্যে।

৮. তামাটে ঘোড়ায় দাভাদোর্জি তার কনেকে পাঠালো বাবা আর দাদাদের কাছে, নিজে রয়ে গেল খাঁয়ের রাজ্যে লোকেদের জল খাইয়ে পায়ের ওপর খাড়া করার জন্যে। দাদারা ওদিকে ভাবল, 'ঘাড়ের ওপর একেই এক বুড়ো বাপ, তার ওপর পাঠাল আরো এক বোঝা।' কুমারীর ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেল ভেড়া চড়াতে।' দাভাদোর্জি ফিরে এসে দেখে বাবা কষ্টে মরোমরো, কনের চোখে জল।

৯. হঠাৎ শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, সামনে এসে দাঁড়াল তামাটে ঘোড়া। দাদাদের সে স্তেপের মাঝখানে ফেলে চলে এসেছে তার মালিকের কাছে। পরের দিন ফিরল দাদারা, তেষ্টায় মরো-মরো, নেই সম্পত্তি, নেই ভেড়ার পাল। বাবা তার চাবুক নিয়ে অকৃতজ্ঞ দাদাদের পিটিয়ে বললে, 'মানুষ নিজের জন্যে জন্মায় না, জন্মায় অন্যের উপকারের জন্যে।'

ব্যাঙের ছাতা আর মটরের লড়াই

বহু রুশী রূপকথায় দেখা যায় ঘটনা ঘটছে 'মটর রাজার আমলে'। এটা হল সেই সময় যখন রাজকুমার ইভান ছাইরঙা নেকড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে রূপকথার রাজ্য সফর করত আর তারই নামধারী আরেক ইভান — বোকা ইভান ঘুরে বেড়াত মামুলি একটা চুল্লির ওপর চেপে। সেই সেকালে পদে পদে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটত। 'সায়ুজমুলৎফিল্ম' স্টুডিও

১। এক যে রাজা — মটর রাজা, ভারী যোদ্ধা। রাজা সবচাইতে বেশি ভালোবাসত কামান থেকে মটর দানার গুলি ছাড়তে।

২। তার রাজ্যের একটু দূরেই ছিল ব্যাঙের ছাতাদের দেশ — রাজা যোড়শ ছত্রাকের রাজত্ব।

৩। ছত্রাকের ছিল এক মেয়ে — সুন্দরী রাজকুমারী থেতা।

৪। বড় ঘরের যত পাত্র ছিল রাজকন্যে একে একে তাদের সকলকে বাতিল করে দিল, তার মনে ধরেছে ঘু'ইফোঁড় নামে এক সামান্য চাষী।

৫। বুঝতেই পারছ, এরকম একজন কেউ তার মেয়ের বর হবে ব্যাঙের ছাতাদের রাজা সে কথা কানেই তোলে না। সে হুকুম দিল, রাজ্যময় যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে সবচেয়ে দুর্গা পাত্রের সঙ্গে সে তার মেয়ের বিয়ে দেবে।

৬। খেতাকে বিয়ে করবে বলে রাজপুরীতে এলো রঙচঙে বিষছত্রাক, ধনী ছত্রাক আর কটুছত্রাক—খেতা ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

৭। ভু'ইফোঁড়কে রাজপুরীতে ঢুকতেই দেওয়া হল না — রাজামশায়ের হুকুম। তবু কিন্তু সে কায়দা করে খেতার কাছে পাঠিয়ে দিল নিজের উপহার — সাদা-মাঠা মেঠো ফুল।

৮। রাজকুমারীর খুশী আর ধরে না। সে বাবাকে জানিয়ে দিল, 'আমাকে মেরে ফেল আর যাই কর, অন্য কাউকে বিয়ে আমি করব না।'

৯। মেয়ের এমন আস্পর্ধা দেখে রাজা ছয়াক ক বনে গেল। এমন সময় নতুন হামলা — মটর রাজ্যের দূত মটরশুঁটি এসে জানাল যে মটর রাজা খেতাকে বৌ করতে চায়, আর রাজী না হলে ব্যাঙের ছাতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামবে।

১০। মটর সৈন্যের দল ততক্ষণে রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। মটরশুঁটিরা দামামা পেটায়, বাছাই মটরে ঠাসা কামান টানে।

১১। সুন্দর চেহারার বিঙ্গছাতাক যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উর্দি পরে দেখতে থাকে ততক্ষণে মটরশুঁটির দল এসে তাকে ঘেরাও করে বন্দী করে ফেলল।

১২। কামান গুম্ গুম্ করে উঠল — বাঁদিক ছত্রাকের বাড়ি বদলে পড়ে রইল কিছু কুচো। গোটা ব্যাঙের ছাতা রাজ্যের শেষকাল ঘনিয়ে এলো বলে।

সম্প্রতি যে নতুন রঙচঙে মজার ছবিটি তুলেছে তার বিষয় হল ব্যাঙের ছাতাদের সঙ্গে রূপকথার মটর রাজার লড়াই। এটি পরিকল্পনা করেছেন চিত্রনাট্যকার ম. লিপ্স্কেরভ, পরিচালক ই. আক্সেনচুক এবং শিল্প নির্দেশক ভ. নিকিতিন। পত্রিকার জন্য ছবিগুলোও ভ. নিকিতিনেরই আঁকা।

১৩। রাজকুমারী দেখল — গতিক সুবিধের নয়। ও তখন খুদে ফুলকো ছাতাকে বলল, 'শিগ্গির ভুঁইফোঁড়ের কাছে ছুটে যা! একমাত্র ও-ই আমাদের বাঁচাতে পারে।'

১৪। ভুঁইফোঁড় দূরের একটা মাঠে ঘাস কাটছিল — যুদ্ধের নামগন্ধও তার কানে যায় নি। শোনামাত্রই কিন্তু সে ব্যাঙের ছাতার রাজ্য রক্ষা করতে ছুটে এলো। মটরশুঁটিদের কাছ থেকে কামান ছিনিয়ে নিয়ে সে মটর রাজার দিকেই কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিল।

১৫। খেতা রাজপুরীর জানলা থেকে লড়াই দেখছিল, তার বড়ই চিন্তা হচ্ছিল।

১৬। দুম্! কামান থেকে মটর ছুটে আসতে মটরশুঁটির খোকারা এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়ল। মটর রাজার কম নাকানি-চুবানি হল না।

১৭। সাহসী ভুঁইফোঁড় পুরস্কার হিসেবে পেল সুন্দরী খেতাকে। আমার কথাটি ফুরাল।

মাটির কলসি

লেভন খাচাত্রিয়ানের আঁকা ছবিতে চীনদেশের রূপকথা

১ – ২। একদিন গরীব এক চাষী তার খেতে লাঙল দিচ্ছিল। হঠাৎ লাঙলটা ভেঙে গেল। এদিক-ওদিক চাইতেই দেখল জমিতে পড়ে আছে বড় একটা মাটির কলসি। খুঁজে-পাওয়া কলসিকে চাষী বাড়ির কাজে লাগাবার জন্য নিয়ে এল: রাখল তাতে যন্ত্রপাতি। সকালে উঠে ঠিক করল ঘাস কাটবে, তাকিয়ে দেখে – কলসিতে দুটো কাস্তে! গরীব চাষী তখন কলসিতে একটা তামার পয়সা ফেলল, আর তা বেড়ে এত হল যে আগুলে সোনা তার।

৩ – ৪। সে কথা হিংসুটে প্রতিবেশীরও কানে গেল। আর সে সর্বস্ব চিৎকার জুড়ল: 'এটা আমার কলসি, ওটা আমি হারিয়ে ফেলেছি!' ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ালে। উজির বাদীদের কথা শুনল আর শুনে তার চক্ষু চড়কগাছ: 'ওহে গ্রামবাসীরা, কলসিটা আন দেখি!' সে তাতে এক রূপোর পয়সা ফেলল – কলসি পয়সায় ভরে গেল। প্রায় না ভেবেই উজির দুই বাদীকেই ভাগিয়ে দেবার হুকুম দিল আর কলসিটা নিজেই দখল করল।

একটু হাসুন!

গত সংখ্যা থেকে আমরা ছাপাতে শুরু করেছি ক্লাসে হাস্যকর প্রশ্নোত্তর, স্কুলের রচনার মজাদার ভুলভ্রান্তি। আপনার এমন কিছু সংগ্রহে থাকলে আমাদের পাঠান।

কথোপকথন

এই ছবিগুলি দেখে একটা গল্প ভাব।

৫ – ৬। গ্রামের সব বাসিন্দা তো উজিরের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক। কুরটনাটা গিয়ে উঠল উজিরের বাবার কানেও। বুড়ো ছুটে এল ছেলের কাছে এবং বলল: 'তোর বাড়িতে দেখছি অনেক সোনার ফুলদানিও আছে। আর এই মাটির কলসি – এ আবার কী রত্ন?' ছেলে তখন কলসিতে একটা সোনার ফুলদানি রাখল। আর তা থেকে হল দুটো, তিনটে, চারটে...। অবাক হয়ে বুড়ো বাপ আর পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না – টালমাটাল হয়ে পড়ল কলসিতে।

৭ – ৮। যেই না বুড়োকে কলসি থেকে টেনে বের করা, অমনি তার পিছু পিছু হাজির অবিকল সেরকমের আর এক বুড়ো। একশ'র বেশি বুড়োয় ঘর গেল ভরে! তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলে আর নিজের বাবাকে কিছুতেই চিনতে পারে না। হৈ-হল্লায় কলসিতে লাগল ধাক্কা, তাতে সেটা ভেঙে হল টুকরো টুকরো। আর লোভী উজিরকে এখন সব বুড়োকে খাওয়ান-পরানোর ভার নিতে হল। খুব শিগগিরই সে দৌলত হারিয়ে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

ভুল কোথায়?

প্রাচীন উপাখ্যান অনুযায়ী, রোমকে বাঁচিয়েছিল হাঁসেরা – শত্রু যখন কেল্লার নিকটবর্তী হচ্ছিল, হাঁসেরা তখন প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকতে শুরু করেছিল।

খোদ এই হাতগুলি দিয়েই মা আমাকে মানুষ করেছে: আদর করেছে, আর মাঝেসাঝে শাসনও করেছে...।

ছুটির সময় আমি গ্রামের বাড়িতে বাবা-মাকে সাহায্য করব: বাগানে জল দেব, কাঠ ও অন্য জিনিস কাটব।

গ্রীষ্মকালে ছোটরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কেননা শীতকালে ঠাণ্ডায় সারা শরীর গুটিয়ে থাকে, আর গ্রীষ্মে গরমে তা ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

এক ঝাঁক হাঁস উড়ছিল; তার মুখোমুখি উড়ে এল একটি হাঁস ও বলল: 'নমস্কার, একশ হাঁসের দল!' তারা তাকে উত্তর দিল: 'আমরা একশ হাঁস নই, তবে এর সঙ্গে যদি আরও এত হাঁস, সঙ্গে তার অর্ধেক, আরও সিকি ভাগ ও তুই যদি আমাদের সঙ্গে থাকতিস, তাহলে সবাই মিলে হতাম একশ হাঁস।'

বল দেখি, ঝাঁকে কতগুলো হাঁস উড়ছিল?

(মার্চ ১৯৮৬)

এই পৃষ্ঠাগুলি
গুছিয়েছেন 'মিশা'
পত্রিকার
('সোভিয়েত ইউনিয়ন'
পত্রিকার প্রকাশন)
সম্পাদকমণ্ডলী।

অর্ধপক্ক যাদুকর

এটি বইপত্রের রূপকথার মতো নয়। এটিকে বলা যায় ফিল্ম-স্ট্রিপ বা কার্টুন ফিল্মের গীতিকাহিনী। কবি ল. দেরবেনোভ আর সুরকার আ. জাৎসেপিন এটি রচনা করেন শিশুদের 'দুঃসাহসী শিরাক' ফিল্মের জন্যে আর যেহেতু তাতে গান গেয়েছেন বিচিত্রানুষ্ঠানের জনপ্রিয় গায়িকা আল্লা পুগাচেভা, তাই অচিরেই গানটি ছোটো-বড়ো সবারই মন জিতে নেয়। বড়োদের এমনি একজন হলেন আমাদের চিত্রকর আনাতোলি সুখোভ — অকম্মা যাদুকরের কাহিনী তোমাদের জন্যে ছবিতে ফুটিয়েছেন তিনি।

১) তারার পথ হিসাব করা...
২)... বাগান ফুলে ফলে ভরা...
৩) ...ঝড়ঝাপটা বশে আনা — যাদুবিদ্যা সবই শেখায়।
৪) সার্টিফিকেট আছে আমার, একটু শুধু খিঁচের ব্যাপার যাদুকরের খেতাবটা তাই রইল কাগজেরই লেখায়।
৫) ধুয়া: গুরুরা সব আমার পিছে খাটল যা, সব হল মিছে, সবার সেরা যাদুকরের কষ্টটুকুই হল সার, হায়, হায়, হায়!
৬) এ-কান থেকে ও-কান দিয়ে গুরুবাক্য যেত বেরিয়ে, অনুশীলন দিতেন যেটা, সেরে যেতাম দায়সারা কাজ।
৭) ভেবেছিলাম হাঁকাব বাজ, পেলাম পাঁঠা মেড়েল-রাজ,
৮) পাঁঠার আবার রঙ গোলাপী তাতে হলুদ রঙের ডোরা।
৯) কোথায় যে লেজ, ঠ্যাঙ টিঙটিঙ, তাতেই আবার দু'জোড়া শিঙ...
১০) অমন পাঁঠা, করো রক্ষে দেখতে কভু চাই না চক্ষে।
১১) ভেবেছিলাম ইন্দ্র হবে — হল হাতি, নেইকো ভবে অমন পাখা, যেন মাছি, নেই কান, শুধু ফুলের গাছি।
১২) স্বপ্নে দেখি, হাতি-ছাগল আমায় করে তোলে পাগল কান্নাকাটি, জিজ্ঞাসায়: 'কেন এমন করলে হায়'?

কৎস্কি মহাশয়

ইউক্রেনীয় লোককথা অবলম্বনে প. উতেভস্কায়া লিখিত 'কৎস্কি মহাশয়' ফিল্ম স্ট্রিপ বেরিয়েছে 'ডায়াফিল্ম' স্টুডিও থেকে। ছবিগুলি শিল্পী ন. এরমাকের আঁকা। এবার বেড়াল, শেয়ালী প্রভৃতি জানোয়ারদের এই কাহিনীটি দেওয়া হল ছোটোদের জন্য।

১) এক কৃপণের ছিল এক বেড়াল। হঠাৎ অসুখে করল বেড়ালটার, ইঁদুর ধরাও ছেড়ে দিলে। কী আর হবে ওকে দিয়ে, এই ভেবে লোকটা তাকে ছেড়ে দিয়ে এল বনে। মন খারাপ হয়ে গেল বেড়ালের। হঠাৎ কোত্থেকে দেখা দিল এক শেয়ালী। জিজ্ঞেস করলে, 'কে তুমি?' বেড়াল দেমাক করে বললে, 'আমিই হলাম কৎস্কি মহাশয়।'

২) এমন একজন মহাশয়ের দেখা পেয়ে শেয়ালী খুব খুশি। 'কৎস্কি মহাশয়, বিয়ে করো আমায়।' 'বেশ,' রাজী হয়ে গেল বেড়াল। শেয়ালী তাকে নিয়ে এল কুড়েয়। যত্ন-আত্তি করে, খাওয়ায়-দাওয়ায়। ভালো হয়ে উঠল বেড়াল, কী তখন তার মেজাজ।

৩) একবার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল খরগোশ। আলাপ-টালাপ হল। শেয়াল তাকে বললে, 'এখন আমার বিয়ে হয়েছে, স্বামী খোদ কৎস্কি মহাশয়। তোকে আর সব জন্তুকেই সে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।'

৪) সারা বনে খবরটা রটিয়ে দিল খরগোশ। দেখা হল নেকড়ের সঙ্গে। বললে, 'বনে এসেছে এক সাংঘাতিক জন্তু — খোদ কৎস্কি মহাশয়।' ভালুক, বন-শুয়োরকেও তাই বললে। জন্তু-জানোয়ারেরা ভাবতে লাগল, কৎস্কি মহাশয়কে তোয়াজ করা যায় কীভাবে।

৫) ঠিক হল, শেয়ালীর সঙ্গে ওকে নেমন্তন্ন করা যাক। কিন্তু কে বলতে যাবে? সবারই মহা ভয়। 'আমি জবরদস্ত, কিন্তু একটা হলে পালাতে পারব না,' বললে ভালুক। 'আমিও পালাতে পারব না,' বললে শুয়োর, 'খুবই মুটকো আমি।'

৬) নেকড়েও কাঁদুনি গাইলে, 'আমি বুড়ো হয়েছি, নুয়ে কুর্নিশ করা আমার পক্ষে মুশকিল। পা-ও আগের মতো নয়। কিছু একটা গড়বড় হলে কৎস্কি মহাশয় রেগে উঠবে।' অগত্যা খরগোশকেই যেতে হল।

৭) শেয়ালীকে ডাকল খরগোশ। 'নেকড়ে, বন-শুয়োর, ভালুক আর আমি — স্বামীর সঙ্গে তোমায় খেতে ডাকছি আমাদের ওখানে।' 'ঠিক আছে,' রাজী হল শেয়ালী, 'তোমরা খাবার-দাবার ঠিক করো গে, তবে নিজেরা লুকিয়ে থেকো, কৎস্কি মহাশয়ের চোখে যেন পড়ো না।'

৮) শুয়োর কার বাগান থেকে খুঁড়ে তুলল আলু, খরগোশ আনলে বাঁধাকপি আর গাজর, ভালুক — মধু, নেকড়ে — মাংস আর চর্বি।

৯) রান্নায় লাগল সবাই মিলে। চেষ্টা করল খাবার যেন ভালো উৎরোয়। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল নিমন্ত্রিতদের জন্যে।

১০) আসছে শেয়ালী আর বেড়াল। ভয় করছে বেড়ালের—জন্তুরা সবাই বড়ো বড়ো, শক্ত-সমর্থ। গায়ে তার কাঁটা দিল। ভয় তাড়াবার জন্যে ফাঁচ-ফাঁচ করতে লাগল।

১১) সে শব্দ শুনে ঘাবড়ে গেল জন্তুরা। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, দে চম্পট। ভালুক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা উঠে পড়ল গাছে। নেকড়ে লুকিয়ে পড়ল বিচালির গাদায়, খরগোশ ঝোপের মধ্যে আর শুয়োর আতঙ্কে ঢুকে পড়ল টেবিলের তলে, বেরিয়ে রইল শুধু লেজ টুকুন।

১২) গরম খাবারের গন্ধ এল বেড়ালের নাকে, খুশি হয়ে উঠল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল খাবারের ওপর, মাংসটার কাছা-কাছি। শেয়ালীর সঙ্গে খায় গবগব করে, মোচ নাড়ায়।... ভরপেট খাওয়ার পর একটু ঢুলুনি মন্দ নয়।

১৩) কোথা থেকে উড়ে এল মশা। 'প্যুন-প্যুন,' গান ধরলে, জাগিয়ে দিল বেড়ালকে, কামড় বসাল শুয়োরের লেজে। মশা তাড়াবার জন্যে লেজ নাড়তে লাগল শুয়োর...

১৪) ...বেড়াল ভাবলে, টেবিলের নিচে বুঝি ইঁদুর। থাবা বসাল বেচারা শুয়োরের লেজে। আমায় খাবে এবার — এই ভেবে শুয়োর টেবিলের তল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে খাঁ-খাঁ করতে করতে একেবারে বনে। বেড়াল ওদিকে নিজেই ভয়ে মরো-মরো।

১৫) ভয়ে কুটির থেকে ছুটে বেরিয়ে একেবারে গাছে। সেই যে গাছটিতে বসে ছিল ভালুক। 'আমায় এবার খেলে,' ভালুক ভাবল মরিয়া হয়ে, 'মরতে তো হবেই, যাই হোক পালিয়ে দেখি।' লাফ দিল নিচে।

১৬) পড়ল একেবারে সেই বিচালির গাদায় যেখানে লুকিয়ে ছিল নেকড়ে। বেচারা নেকড়ে, কী সে ভাবল বলো তো? কী আর, ভাবল খোদ কৎস্কি মহাশয়ই তাকে ধরতে এসেছে। ভয়ে খাঁক-খাঁক করে উঠল নেকড়ে।

১৭) একেবারে বনের অন্য প্রান্তে গিয়ে হাঁপ ছাড়ল জন্তুরা। বলাবলি করলে, 'কেমন জানোয়ার দ্যাখো কৎস্কি মহাশয়। ওইটুকু দেখতে কিন্তু একটু হলেই খেত আমাদের সবাইকে।'

১৮) আর সবাইকেই ভয় পাইয়ে দিয়েছে বলে শেয়ালী ও বেড়ালের অহংকার আর ধরে না। খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরল তারা।

পতাপ ভালুক আর লারিসকা শেয়াল

এবার সাহিত্যিক মাতভেয়েভের একটি কাহিনী।

তা নিয়ে 'ডায়াফিল্ম' স্টুডিও থেকে একটি স্লিপ বেরিয়েছে। শিল্পী — প. রেপকিন।

১) কাহিনীটা শুনেছি রিয়াজানস্ক বনের হরিণের কাছে। বনটা প্রকাণ্ড, সুন্দর, অনেক সায়র আর নদী আছে সেখানে। আর জন্তু জানোয়ার এত যে গুনে শেষ করা যায় না।

২) তা লারিসকা শেয়ালের কানে গেল যে পতাপ ভালুক মধু খায়, তা নাকি ভারি মিষ্টি, সর্দি-কাশি সেরে যায় তাতে। নিজেরই ইচ্ছে হল চেখে দেখতে। কিন্তু কী করে?

৩) ঠিক করল রোগের ভান করবে, পতাপের কাছে মধু চাইবে। যায় আর হাঁচে, কেবল শোনা যায়, 'হাঁচ্চো, হাঁচ্চো!'

৪) 'আমার এখন মধু নেই, শেষটুকু খেয়ে ফেলেছি কাল', বললে ভালুক, 'শুধু একটা কোটর আছে, তবে অনেক উঁচুতে। কাল সকালে একসঙ্গে যাব।'

৫) সারা রাত লারিসকা মধুর স্বপ্ন দেখল। কখনো সে যেন চার পায়ে ছোটে, কখনো ওড়ে ডানা মেলে। মধু সে তো কখনো খায় নি, কেমন জিনিস তাও জানে না।

৬) সকালে সূর্য উঠতে না উঠতেই সে ছুটে গেল ভালুকের কাছে। সে ততক্ষণে উঠেছে, স্নান সেরেছে নদীতে। বললে, 'চল যাই লারিসকা মধু খেতে।'

৭) যেতে, যেতে, যেতে তারা পৌঁছল সায়রের কিনারায় বুড়ো লাইম গাছের কাছে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে তাতে কোটর। কী যেন বনবন করছে সেখানে। লারিসকা শেয়াল ভাবলে, 'বটে, মধু বনবন করছে।'

৮) পতাপ ভালুক ওদিকে নখ শানিয়ে নিল গাছের গোড়ায়, মাথায় রুমাল বেঁধে উঠতে লাগল কোটরের দিকে। 'আমি মধু পাড়ব, তুই নিচে কুড়িয়ে গাদা করিস। পরে খাব একসঙ্গে।'

৯) লারিসকা শেয়াল বসে আছে মধুর অপেক্ষায়, আগে থেকেই ঠিক চাটে: 'ভালুক উঠে কোটরে ঘা কষবার কষবে, তারপর নেমে আসবে, ততক্ষণে আমি মধু খেয়ে সাবাড় করব।'

১০) পতাপ ভালুক উঠল গাছে, থাবা বাড়ালে কোটরের দিকে। একবার বাড়ায়, হল না, দু'বার বাড়ায় হল না, তিন বারের বার সমস্ত শক্তিতে চাড় দিতেই পুরনো কোটর ভেঙে পড়ল, ভালুকও ধপাস করে নিচে।

১১) তার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে মৌমাছি। 'ওহো, এইবার আমি মধু খেয়ে পেট ভরাব।' খুশি হয়ে উঠল লারিসকা শেয়াল। নাক গুঁজলে মৌমাছির ঝাঁকের একেবারে মাঝখানে।

১২) মৌমাছিরা হুল ফুটোতে লাগল এই ঠোঁটে, এই নাকে, এই কানে। মনে হল যেন আগুনের মধ্যে পড়েছে। 'গেলাম, গেলাম! পতাপ ভালুক, বাঁচাও আমায়!'

১৩) ভালুকের তখন নিজেরই অবস্থা কাহিল। মৌমাছির ঝাঁক একেবারে দল বাঁধা। ভালুক দেখে ব্যাপার সুবিধের নয়। প্রাণপণে হাঁকড়াল, 'যে পারো বাঁচো!' ডিগবাজি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

১৪) তার পেছু পেছু লারিসকা শেয়াল। সারা শরীর জলে, শুধু বেরিয়ে আছে নাক। আর মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, চেষ্টা করছে হুল ফুটোবার। ওদিকে বনের সায়রের জল ঠাণ্ডা। জমে গেল ভালুক আর শেয়াল, ঠক ঠক করছে দাঁত, অথচ উঠে আসার উপায় নেই, মৌমাছিরা ছাড়বে না।

১৫) ওইভাবেই কাটল রাত পর্যন্ত। মৌমাছিরা ঘুমতে গেলে অন্ধকারে ফিরল বাড়িতে। ভালুক বললে, 'কোটরটা ছিল একেবারে পচা, আর মৌমাছিরা সবাই একজোট। যাক-গে, ভোরে উঠে অন্য কোটর খুঁজে বার করব।' 'আমি যাব না তোর সঙ্গে' — বললে লারিসকা শেয়াল, 'তোর মধু বড়ো কামড়ায়। বরং ইঁদুর ধরব।'

১৬) বুড়ো হরিণ যখন এই কাহিনী শোনাচ্ছিল তখন পালক ফুলিয়ে ডালে বসে ছিল আরকা কাক, আর পাশেই দুরপাক খাচ্ছিল ছাতার পাখি সোফকা। 'বাজে কথা, বাজে কথা' — কিচির-মিচির করে উঠল সোফকা। 'ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে' — কা-কা করলে আরকা কাক। কিন্তু ছাতার পাখি সোফকার কথায় বিশ্বাস হয় নি আমার। বড়ো বেশি বকে। সত্যি কথাই হয়ত বলেছে হরিণ।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

ভালুক কেন অভাবে ভোগে?

প্রতিটি জীবজন্তুই তার শীতের খাবার আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে। কাঠবিড়ালি গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখে বাদাম আর ব্যাঙের ছাতা, ইঁদুর টেনে নিয়ে যায় ফসলের দানা তার গর্তে। আর সারা শীতটা চলার মতো যথেষ্ট খাবার পেয়েও যায় তারা। কেবল ভালুকই সারা শীতকাল তার শূন্য গুহায় ঘুমিয়ে কাটায়। দীর্ঘ শীত একটানা ঘুমিয়ে কাটায় সে, আর শোনা যায় সে নাকি খালি নিজের থাবা চুষে সন্তুষ্ট থাকে। এই জন্যেই বসন্তকালে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে যেমন রোগা তেমনই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, আর তার মেজাজও ওঠে তিরিক্ষি হয়ে।

কিন্তু জবুথবু বুড়ো ভালুক কেন নিজের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে রাখে না বলতে পার? সেই গল্পই এখানে তোমাদের বলছেন ভ. সুতেয়েভ। 'সয়ুজমুল্ত-ফিল্ম' নামে কার্টুন-ছবি তৈরির স্টুডিওর পরিচালক ইউ. প্রিত্কোভ ও শিল্পী-প্রযোজক আ. ভোল্কভের তত্ত্বাবধানে 'মিশাখুড়ো' নাম দিয়ে এই গল্পটির একটি চিত্ররূপ দেয়া হয়েছে সম্প্রতি। ভোল্কভ আমাদের পাঠকদের জন্যে কার্টুন-ছবিগুলিও এ'কেছেন এখানে।

২) মিশা টেনেটেনে গাজর তুলতে শুরু করলে, কিন্তু এ কাজে এতই আনাড়ি ছিল ও যে গাজরগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে যেতে লাগল... সত্যি বলতে কি, একটা গাজর তো ছিটকে গিয়ে সোজা শজারুর কপালে লাগল।

৪) আর যে কথা সেই কাজ! গাজরের কথা বেমালুম ভুলে ভালুক শজারুর সঙ্গে বনের পথ ধরল ব্যাঙের ছাতা তুলতে। শজারু ভালুককে তার ঝাঁপিটা দিয়ে দিল। অবাক হয়ে ভালুক শুধোল, 'তা, ঝাঁপি ছাড়া তুমি ব্যাঙের ছাতা আনবে কী করে?' 'আরে, ঘাবড়াচ্ছ কেন খুড়ো? ঝাঁপি ছাড়াও আমি ব্যাঙের ছাতা বয়ে আনতে পারি,' বলল শজারু।

১) একদিন ভালুক 'মিশাখুড়ো' খরগোশকে তার সবজিবাগানে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে ডেকে বললে: 'খরগোশ-ভায়া, বলি করছ কি ওখানে?' 'দেখতেই তো পাচ্ছ মিশাখুড়ো, মাটির তলা থেকে আমি গাজর তুলছি।' 'তা, আমারও তো গাজর খেতে ভালো লাগতে পারে, না কী?' গজগজ করে বললে ভালুক। খরগোশ বললে, 'তা তোল-না, যত ইচ্ছে গাজর তুলে নিয়ে যাও।'

৩) 'কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছে দ্যাখো!' রেগে উঠে হিসহিসিয়ে বললে শজারু। ভালুক বললে, 'বড্ড দুঃখিত, ভাই কাঁটামুখো।' তারপর শজারুকে সে শুধোল, 'তা, ভাই, তুমি চললে কোথায়?' 'বনে যাচ্ছি মিশাখুড়ো, ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে।' ভালুক বলল, 'আমারও কিছু ব্যাঙের ছাতা পেলে মন্দ হয় না। শীতের জন্যে তাহলে খানিকটা খাবার জমা করে রাখতে পারি।'

৫) শজারু বনের মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে ব্যাঙের ছাতা তুলতে লাগল আর সেগুলো তার গায়ের কাঁটায় বিঁধিয়ে রাখতে লাগল। দেখা গেল, সত্যিই শজারুর ঝাঁপির দরকার করে না।

৬) এদিকে জব্থব্, আনাড়ি ভাল্লুক করলে কী, ভালোজাতের ব্যাঙের ছাতাগুলো পায়ে মাড়িয়ে দলে-পিষে যতসব বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা তুলে-তুলে রাখতে লাগল তার ঝাঁপিতে। আসলে মিশাখুড়ো ব্যাঙের ছাতার ভালোমন্দ কিছুই বুঝত না — এই হল গিয়ে ব্যাপার। যাই হোক, এমন সময় একটা ঝাউ-গাছ থেকে কাঠবিড়ালি তাকে ডেকে বললে, 'ও মিশাখুড়ো, তোমার তোলা ওই ব্যাঙের ছাতা কোনো কম্মের নয়, বুঝলে? এর চেয়ে তুমি বরং বাদাম যোগাড় কর গিয়ে, বাদাম কত ভালো জিনিস তা জানো তো?'

৭) ভাল্লুক ওর কথায় সায় দিয়ে বললে, 'তা যা বলেছিস, বাদাম এর চেয়ে ভালো জিনিস নিশ্চয়ই। পথে যেতে তার সঙ্গে দেখা বেড়ালের। বেড়াল কতগুলো মাছধরা-ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল। ভাল্লুক ডাকে শুধোল, 'চললে কোথায় ডোরাকাটা সুন্দরী?' 'মাছ ধরতে চলেছি মিশাখুড়ো। ছানাপোনাদের জন্যে কিছু মাছ ধরা দরকার।' ভাল্লুক বললে, 'আমিও মাছ খুব ভালোবাসি, তাছাড়া শীতের জন্যে কিছু খাবারেরও যোগাড় রাখা দরকার।' 'তাহলে চল, যাওয়া যাক,' বেড়াল বললে, 'আমার কাছে বাড়তি একটা মাছধরা-ছিপও আছে, কোনো অসুবিধে নেই।'

৮) ওরা দু'জন এরপর নদীতে গিয়ে ছিপ ফেললে। আর বেড়ালের চোখে দেখতে-দেখতে মাছ পড়ল। এরপর মাছের পর মাছ ধরে চলল বেড়াল। ওদিকে ভাল্লুক তন্দ্রায় ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল আর স্বপ্ন দেখতে লাগল তন্দ্রার ঘোরে। ফলে তার আর মাছ ধরা হল না।

১০) যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এল তখন শেয়াল আর ভাল্লুক চুপিচুপি মুরগির খোঁয়াড়ের কাছে গেল। শেয়াল খোঁয়াড়ের বেড়ার একখানা তক্তা খুলে ফেলে ফিসফিস করে বললে, 'মিশাখুড়ো, তুমি এখানটায় দাঁড়িয়ে পাহারা দাও দিকি, আমি ততক্ষণে কয়েকটা মুরগি আর হাঁস ধরে নিয়ে আসি।'

১২) পরদিন সকালবেলায় ভাল্লুক জঙ্গল বেরিয়ে এল... এমন সময় পুঁচকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কী হল তোমার, মিশাখুড়ো?' মিশা জবাব দিলে, 'আমার অপরাধ, শীতের জন্যে কিছু খাবারদাবার যোগাড় করতে গিয়েছিলাম, এই আর-কি। তা, প্রথমে তুললাম গাজর, কুড়োলাম ব্যাঙের ছাতা, বাদামসুদ্ধ একটা গাছ উপড়ে তুললাম, তারপর গেলাম মাছ ধরতে আর শেষে গেলাম মুরগি ধরতে। আর এমনই আমার কপাল যে কেন যেন কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না।'

৯) আর স্বপ্নের ঘোরে একসময় ভাল্লুকের মনে হল, কে যেন কাছেপিঠে খিলখিল করে হাসছে। তাড়াতাড়ি চোখ মেলে সে দেখে, তার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে শেয়াল। শেয়াল বললে, 'মিশাখুড়ো, তুমি বৃথাই এই ছেলেখেলার সময় নষ্ট করছ। বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, আমরা দু'জনে মিলে ক'টা মুরগি ধরি গিয়ে।' শুনে খুশি হয়ে মিশা বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছ। মুরগি পেলে খাসা ব্যাপার হবে।'

১১) কিন্তু ভাল্লুককে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হল না। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে যমদূতের মতো কয়েকটা কুকুর ছুটে এসে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশাখুড়োর ওপর। ফলে মিশা সাংঘাতিক ঝামেলায় পড়ে গেল। আর সেই অবসরে শেয়াল দিব্যি নিশ্চিন্তে মুরগির খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এল আর মুখে করে বাড়ি নিয়ে গেল একটা আস্ত মুরগি আর তার একটা ছানাকে।

১৩) এই জন্যেই সেবারের শীতে ভাল্লুককে তার গুহায় বসে শুধু নিজের থাবা চুষে খেতে হল। আর এর জন্যে দায়ী ছিল সে নিজেই, কেননা নিজের মতো না করে অন্য লোকের মতো জীবন ধারণের চেষ্টা করলে তার ফল কখনও ভালো হতে পারে না।

ছেয়ে-কপালে বেড়াল, ছাগল আর ভেড়া

এক-যে ছিল ছাগল আর এক ভেড়া। থাকত তারা উঠোনে, তবে মিলেমিশে: ছেঁড়া-খোঁড়া ঘাস-বিচালি, তাও আধাআধি।

আর বাড়ির ভেতরে থাকত ছেয়ে-কপালে বেড়াল, এমন ডাকু, সর্বদাই কোনো একটা মতলব নিয়ে আছে। কিছু পড়ে থাকতে দেখলে নির্ঘাৎ সেটি মেরে দেবে। ছাগল আর ভেড়া একদিন দেখে বেড়াল যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে। ছাগল আর ভেড়া জিগ্যেস করলে: 'কাঁদছিস কেন রে?'

'না কেঁদে কী করি? গিন্নি আমায় পিটিয়েছে, আবার শাসিয়েছে যে টুঁটি চিপে মারবে। ক্রিম খেয়েছি বলে। আবার আমায় বললে, জামাই আসবে, কী খাওয়াই? ছাগল আর ভেড়াটাকেই জবাই করতে হবে দেখছি।'

ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে উঠল ছাগল আর ভেড়া: 'আর তুই, হাঁদা-কপালে ছেয়ে বেড়াল, কেন আমাদের সর্বনাশ করলি। দাঁড়া তোকে ঢুঁসোচ্ছি।' মিউ-মিউ বেড়াল তখন ক্ষমা চাইলে। ছাগল আর ভেড়া তাকে মাপ করে দিয়ে ভাবতে লাগল কী করা যায়।

বেড়াল শুধোল, 'আচ্ছা ভায়ারা, তোমাদের কপাল কতটা শক্ত? বেড়ার দরজায় ঢুঁ মারো তো।' ভেড়া ছুটে গিয়ে ঢুঁ মারল বেড়ায়, দরজা টলে উঠল, কিন্তু খুলল না। তখন মহাছাগ ছুটে গিয়ে মারলে ঢুঁ। খুলে গেল বেড়া। ছুটে পালাল ছাগল, ভেড়া আর ছেয়ে-কপালে বেড়াল।

হয়রান হয়ে গেল বেড়াল। ছাগল তাকে নিজের পিঠে চাপিয়ে ছুটতে লাগল পাহাড় প্রান্তর টপকে, ঝুর-ঝুরে বালি ভেঙে যতক্ষণ ঠ্যাঙে জোর রইল ততক্ষণ ছুটল তারা।

একসময় থামল সবাই জিরিয়ে নিতে। ওদিকে শরতের রাত, ভারি ঠান্ডা। আগুন পাওয়া যায় কোথায়? ছাগল আর ভেড়া তাই নিয়ে ভাবছে, ওদিকে ছেয়ে-কপালে শুকনো বার্চের ছাল জোগাড় করে ছাগলের শিঙে জড়িয়ে দিলে, ওদের বললে ঢুঁসোঢুঁসি করতে।

ছাগল আর ভেড়া দু'জন দু'জনকে এমন জোর ঢুঁ মারলে যে চোখ থেকে ফুলকি ঝরে পড়ল। জ্বলে উঠল বার্চ ছাল। অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ওরা বসল গা গরম করে নিতে।

'ডায়াফিল্ম' স্টুডিওর এই নতুন কাজটির (ছবি এ'কেছেন ন. ইয়ের-মাক) অবলম্বন রুশী লৌকিক কাহিনী। সেটিকে কথায় সাজিয়েছেন প্রখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক আলেক্সেই তলস্তয়। শিশুদের জন্য ইনি অনেক লিখেছেন।

ভালো করে গরম হতে না হতে দেখে করুণ স্বরে মিনতি করছে অনাহুত অতিথি, ভালুক। 'একটু গা গরম করতে, বিশ্রাম নিতে দাও। মৌচাকে গিয়েছিলাম মধু খেতে, তা মারামারি হয়ে গেল চাষীদের সঙ্গে।'

চারজনে ওরা ঠিক করতে লাগল অন্ধকার রাতটা কাটাবে কে কোথায়। ভালুক গেল বিচালি-স্তূপের নিচে, বেড়াল তার ওপরে, ছাগল আর ভেড়া রইল ধুনির কাছে। হঠাৎ দেখে, আসছে সাতটি নেকড়ে। শাদা রঙের আট নম্বরটি হানা দিল সরাসরি বিচালির স্তূপে।

আর ছেয়ে-কপালে বেড়াল বক্তৃতা ঝাড়লে, 'আরে তুই শাদা নেকড়ে, আমাদের বড়দাকে রাগাস নে, ও চটে উঠলে কারো আর মঙ্গল নেই। দেখছিস কেমন ওর দাড়ি? ওইখানেই ওর শক্তি। তার চেয়ে বরং বিচালির নিচে যে শুয়ে আছে, তার সঙ্গেই পাঞ্জা লড়ে দেখ।'

নেকড়েরা ভালুককে ঘেরাও করে জ্বালাতে লাগল তাকে। ভালুক অনেকক্ষণ সহ্য করে করে শেষ পর্যন্ত একেকটা থাবায় ধরতে লাগল একেকটা নেকড়ে। ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে চম্পট দিল তারা।

ছাগল আর ভেড়া ততক্ষণে বেড়ালকে তুলে নিয়ে ছুটে গেল বনে। ফের ছেয়ে নেকড়েদের সঙ্গে দেখা। চটপট বেড়াল উঠে গেল ফার গাছের চূড়োয়। ছাগল আর ভেড়া ফারের ডাল ধরে ঝুলতে লাগল।

ওদিকে ফার গাছের নিচে দাঁত কড়মড় করছে নেকড়ে-গুলো। ছেয়ে-কপালে বেড়াল দেখে গতিক খারাপ। তাদের দিকে ফার গাছের মোচা ছুড়তে ছুড়তে বলে, 'একটা নেকড়ে! দুটো নেকড়ে! তিনটে নেকড়ে!..'

'সবই তো আমার ভাইয়ের জন্যেই লেগে যাবে। কিন্তু আগে আমি দুটো নেকড়ে খেয়েছি। তুমি বড়দা, নিজেরটার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগটাও নাও।' ছাগল তখন ডাল ছেড়ে শিঙ বাগিয়ে পড়ল গিয়ে সোজা নেকড়ের ওপর। বেড়াল ওদিকে চাঁচাচ্ছে 'ধরো, পাকড়াও করো!'

তখন এমন তড়কে গেল নেকড়েরা যে কোনো দিকে না চেয়ে একেবারে ভোঁ দৌড়। আর ছেয়ে-কপালে বেড়াল, ছাগল আর ভেড়া চলল তাদের নিজেদের পথ ধরে।

জলের তলায় সর্বকর্মা

সর্বকর্মা হল গিয়ে ছোটখাট একটি লৌহমানব — যেমন সে দয়ালু, তেমনই হাসিখুশি। জর্জিয়ার কার্টুন-আঁকিয়েরা প্রথম যখন তাকে ফিল্মের পর্দায় দেখান তার পর বহু বছর কেটে গেছে।

চিত্রনাট্যকার ন. বেনাশ্‌ভিলি, পরিচালক ভ. বাখ্‌তাদ্‌জে এবং শিল্পী ভ. নাজারুক তাঁদের নতুন ফিল্মে সর্বকর্মাকে এবার পাঠিয়েছেন জলের নিচে এক পর্যটনে।

১) সমুদ্রের ধার বরাবর উড়ে যেতে যেতে সর্বকর্মার একদিন নজরে পড়ল যে ভাঙ্কা নামে ছোট্ট একটি ছেলে সময় কাটাবার মতো আর কিছু করার না-পেয়ে জলে ছোট-ছোট কাঠি ছুড়ে ফেলছে।

দেখে সর্বকর্মা ছেলেটিকে বলল, 'এমন বাজে সময় নষ্ট করা খেলা তো দেখি নি কোথাও! তা বাপু, এর বদলে তুমি একখানা ছোট্ট নৌকো বানাও না কেন ?'

২) যে কথা সেই কাজ! ভাঙ্কা মহা উৎসাহে নৌকো বানাতে লেগে গেল, তাকে সাহায্য করতে লাগল তার ছোট্ট কুকুর কুর্‌শা। কিন্তু ইতিমধ্যে মস্ত বড় একটা মাছ যে সাঁতার দিয়ে পাড়ের কাছে এসে পড়েছে, দুই বন্ধু সেটা খেয়াল করে নি। মাছটা হঠাৎ কুর্‌শাকে মুখে নিয়ে টুপ করে ডুব দিল জলের তলায়।

৩) 'কে আছ! আমার কুর্‌শাকে বাঁচাও!' বলে খ্যাপার মতো চেঁচাতে লাগল ভাঙ্কা। সঙ্গে সঙ্গে সর্বকর্মা এসে হাজির। আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে একখানা সাবমেরিন জাহাজ বানিয়ে নিয়ে কুর্‌শার সন্ধানে সমুদ্রের জলের তলায় যাত্রা করল সে।

৪) সমুদ্রের নিচে সাগরের রাজা অক্টোপাস তার প্রাসাদে বসে-বসে বড়ই বিরক্ত হচ্ছিল। কেবল পৃথিবীর ওপরকার এই ছোট্ট কুকুরটাই তাকে ফুর্তিতে রাখতে শুরু করেছে সবে। তাই রাজা অক্টোপাস প্রতিজ্ঞা করল যে কুকুরটাকে জীবনে কখনও ছাড়বে না সে।

৫) এদিকে সর্বকর্মা সমুদ্রের তলায় নামছে তো নামছেই, অথচ কুরুশার নামগন্ধও খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। সাবমেরিনের চারপাশে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে কত যে অদ্ভুত আর সুন্দর-সুন্দর মাছ কী বলব!

৬) হঠাৎ সর্বকর্মা দ্যাখে কী, দাঁতের সারির ঝিলিক হেনে লম্বা হাঁ-মুখখানা মেলে এসে হাজির হয়েছে একটা করাতমাছ। দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে সাবমেরিনটাকে ফালাফালা করে চিরে ফেলল মাছটা, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের সওয়ারির ওপর। কিন্তু হলে কী হবে, ও যে লোহা দিয়ে তৈরি। তাই ওকে কামড়াতে গিয়ে মাছটারই দাঁতগুলো গেল ভেঙে।

৭) এই ধাক্কা সামলে উঠতে-না-উঠতে সর্বকর্মা দ্যাখে, একটা হাঙর এক শুশুককে তাড়া করে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বকর্মা চেঁচিয়ে বলল, 'ওটাকে আমার বন্ধুর ক্ষতি করতে দেব না!' ওর যন্ত্রটা থেকে একটা আলোর ছটা ছাড়িয়ে শয়তান মাছটাকে ও তাড়িয়ে দিল।

৮) সর্বকর্মা আর শুশুক-বন্ধু এবার রাজা অক্টোপাসের প্রাসাদ খুঁজে বের করে। কিন্তু দেখা গেল, প্রাসাদে ঢোকা বড় সহজ ব্যাপার নয়। রাজা অক্টোপাস খালি কালির মেঘ ছাড়ে আর প্রাসাদের সিংদরজা সেই মেঘে আড়াল হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে সর্বকর্মার সঙ্গে একটা আলোর বালব ছিল আর কাছেই ছিল একটা আলো-ঝলমলে চওড়া চ্যাপ্টা মাছ, অর্থাৎ জ্যান্ত একটা বিদ্যুৎ-স্টেশন।

৯) রাজা অক্টোপাসের রাজত্বে সাংঘাতিক হুলুস্থুল পড়ে গেল। কুরুশা এসে খুশির ঘেউ ঘেউ ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বকর্মার গায়ে। সাগরের রাজা কিন্তু শোকে-দুঃখে অধীর হয়ে উঠল। ছোট্ট কুকুরটাকে ছেড়ে থাকার চিন্তা তার অসহ্য ঠেকল।

১০) রাজা অক্টোপাস পৃথিবীর কুকুরের বদলে সাগরের যত কিছু ঐশ্বর্য সব দিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ঘুসে ভোলবার পাত্র নয় আমাদের সর্বকর্মা।

১১) অবশেষে সাগরের রাজার অবস্থা দেখে মায়া হল তার। রাজাকে খুশি করতে তাই সর্বকর্মা ওকে হুবহু কুরুশার মতো দেখতে ছোট্ট একটা রোবট-কুকুর বানিয়ে দিল।

১২) তারপর বন্ধু শুশুকের সাহায্যে সর্বকর্মা আর কুরুশা সমুদ্রের তলা থেকে ওপরে ডাঙায় উঠে এল। ভাঝাকে তার কুকুর কুরুশা ফিরিয়ে দিয়ে সর্বকর্মা ফের উড়ে চলল আকাশে, ফাঁপরে-পড়া অন্য বাচ্চাদের সাহায্য করতে।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

বুখারায় নাসরেদ্দিন

নাসরেদ্দিন সুরসিক, বুদ্ধিতে সে তুখোড়, গরিব-দুঃখীদের রক্ষক, লোককাহিনী আর চুটকি গল্পের নায়ক। আজারবাইজানী আর তুর্কী, পারসিক আর তাজিক — নানান জাতি তাকে মনে করে নিজেদেরই লোক। রুমানিয়া, সার্বিয়া আর গ্রীসেও নাসরেদ্দিন জনপ্রিয়। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন শহর বুখারার তো দৃঢ় বিশ্বাস, নাসরেদ্দিনের জন্ম সেখানেই। রুশীদের মধ্যে নাসরেদ্দিনের নাম ছড়ান লেখক ল. সলোভিওভ। তাঁর 'খোজা নাসরেদ্দিনের কাহিনী'র প্রথম অংশ নিয়ে তোলা ছায়াছবিটির সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ছবি এ'কেছেন আ. ভিনোকুরভ, ল. শ্ভার্ত্‌স্‌মান।

অনেকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করার পর বিখ্যাত খোজা নাসরেদ্দিন তো ফিরে এল তার জন্মভূমি বুখারায়। জীবনে প্রথম সুখের মুখ দেখল সে, পেয়ে গেল অনেক টাকা। তাহলে বাড়ি কিনবে, আমিরের লোকেরা যাতে তাকে জ্বালাতন না করে তার জন্যে নাম বদলাবে। সত্যিই, স্থির হয়ে বসার সময় হয়েছে বৈকি।

১) ওদিকে তার যে গাধা সেটিও কম বিখ্যাত নয়, লাগামের টান কষা না থাকায় মনিবের আনমনা ভাবের সুযোগ নিয়ে সে লাফ দিলে খালের ওপর দিয়ে। জিন থেকে ছিটকে পড়ল নাসরেদ্দিন। ভেবেছিল গাধাটাকে গালাগালি করবে...

২) ...কিন্তু নজরে পড়ল, বেড়ার ছায়ায় কিছু লোক বসে আছে, তার পড়ে-যাওয়া দেখেছে তারা। তাই ঠিক করল নিজেকে নিয়েই হাসাহাসি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই হাসতে লাগল খিলখিল করে, কিন্তু দেখে অবাক লাগল যে কেউ তার হাসিতে যোগ দিচ্ছে না। 'ব্যাপার কী, হাসি শোনা যাচ্ছে না কেন?'

৩) একজন বুড়ো খোজাকে বললে: 'ঘণ্টাখানেক আগে বরকন্দাজদের নিয়ে মহাজন জাফর গেছে এখান দিয়ে। আমরা সবাই তার কাছে টাকা ধারি। শোধ দেবার মেয়াদ ফুরোচ্ছে কাল, আমরা হয়ে পড়ব দীনহীন ভবঘুরে।'

৪) 'কত ধার তোমার?' — জিজ্ঞেস করলে নাসরেদ্দিন। 'অনেক, আড়াই শ' তন্‌খা।' নাসরেদ্দিন তার জিন থেকে থলি খুলে টাকা বার করলে। 'এই নাও গো ভালোমানুষের পো, আড়াই শ' তন্‌খা দিয়ে দিও।' আনন্দে কে'দে ফেললে বুড়ো।

৫) তখন বাকিরাও ধীরে ধীরে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলে। নাসরেদ্দিন দেখে আঁকিবুকি কাটা মুখ, কে'দে কে'দে চোখ ঝাপসা। নাসরেদ্দিন তার থলি খুলে মাটিতে রাখল: 'নাও, যার যত দরকার।' শিগগিরই খালি হয়ে গেল থলি।

৬) তখন হো-হো করে হাসতে লাগল সবাই। হাসতে হাসতে বলে: 'আর তুমি বাপু গাধা থেকে ছিটকে পড়েছিলে জবর।' গরিবদের কাছ থেকে বিদায় নিলে নাসরেদ্দিন। এখন রওনা দিতে হয়। ফের সেই গরিব, হাসিখুশি ভবঘুরে...
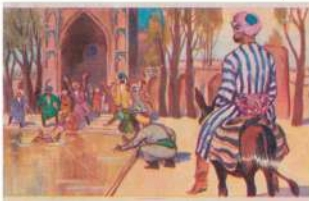
৭) পথ তার গেছে একটা পুকুরের পাশ দিয়ে। দেখে, তীরে একদল লোক, হাত নাড়ছে আর কী যেন বলে চ্যাঁচাচ্ছে। কাছে এসে দেখা গেল দামী জোব্বা আর পাগড়ি পরা একটা লোক ডুবছে। তীর থেকে সবাই চ্যাঁচাচ্ছে — 'হাত দাও!', কিন্তু সেকথা লোকটার যেন কানে যাচ্ছে না।

৮) 'আরে সব আহাম্মক খেপা! — চেঁচিয়ে বললে খোজা। — পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা ধনী। ওভাবে ওকে বাঁচানো যাবে না। মনে রেখো মূর্খেরা, ধনীরা কখনো দেয় না, কেবল নেয়।'

৯) হাত বাড়িয়ে খোজা ডুবন্তকে বললে: 'নাও!' সেও অমনি হাত ধরে উঠে এল তীরে। সবাই একেবারে অবাক। সবাই দেখল লোকটার পিঠে একটা মস্তো কুঁজ।

১০) লোকটা যখন পাল-কিতে চাপল, তখন টনক নড়ল নাসরেদ্দিনের। যাকে সে বাঁচাল সে যে জাফর। আফশোসে তার কথাই বন্ধ হয়ে গেল। সম্বিত ফিরতে লোকেদের সে বললে:

১১) 'জাফরের দেনদার কেউ আছে তোমাদের মধ্যে?' মুখ চুন করে এগিয়ে এল জনা বিশেক লোক। খোজা বললে, 'আমি তোমাদের জালিমকে বাঁচিয়েছি, খারাপ কাজ করেছি, কিন্তু আমিই তা শোধরাব। আমার বাপের দাড়ির দিব্যি, মহাজনটিকে আমি এই হৌজেই ডোবাব।'

১২) এই দিব্যির পর সুখ-দুঃখের নানা ঘটনা ঘটেছে। খোজা নাসরেদ্দিন সাধারণ লোকেদের রক্ষা করার জন্যে বিরক্তি করেছে আমির-উজিরদের। তার জন্যে আমি-রের সেপাইরা পাকড়াও করে তাকে। চামড়ার মশকে পুরে রাত্রে আহমেদ হৌজের পবিত্র পানিতে তাকে ডুবিয়ে মারার কথা, সেই হৌজ যেখানে জাফর ডুবছিল। তিনজন সেপাই টেনে আনছিল মশক। হঠাৎ তার ভেতর থেকে শোনা গেল চাপা গলা: 'বাহাদুর সেপাইরা, মরার আগে আমি একটু অনুতাপ করতে চাই আর কারশিন কবরখানায় যে দশ হাজার তন্খা আমি জমিয়ে রেখেছি সেটা কোনো ভালোমানুষকে দিয়ে যাব, ভালো কাজে সে যেন সেটা খরচা করে।'

১৩) সেপাইরা বললে, 'খোজা, ভেবো না আমরা খারাপ লোক। চাকরি করি বলেই তোমায় শাস্তি দিতে টেনে এনেছি।' খোজা বললে, 'আমি তা বিশ্বাস করি। আমার মরণের পর তোমরা এই টাকাটা খুঁজে বার করে নিও, ওটা ত্রিভুজাকারে বসানো তিনটে কবরের নিচে।'

১৪) সেপাইরা ছুটল কবরখানায়। এই সময় রাস্তায় দেখা গেল মহাজন জাফরকে। মশক দেখে ভাবলে, ওর মধ্যে দামী জিনিস কিছু আছে, তার মুখ খুলে ফেললে। খোজা দেখেই চিনতে পারল মহাজনকে। মশক থেকে না বেরিয়ে খোজা ভয়ংকর গলায় ডাক ছাড়ল। ভয় পেয়ে গেল মহাজন।

১৫) ভাবলে, মশকে আছে জীন, হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজল। মশক থেকে বেরিয়ে এল খোজা, ভয়ে আধমরা জাফরকে তার ভেতর পুরে চটপট মশকের মুখ বেঁধে লুকিয়ে পড়ল নিজে। প্রতারিত হয়ে সেপাইরা ফিরল রেগেমেগে। যত কিলচড় সব পড়ল জাফরের ওপর।

১৬) পবিত্র আহমেদ হৌজে তারা টেনে আনল মশক। বধ্যস্থল ঘিরে রইল সৈন্যের কাতার। আমিরের ভয় ছিল লোকে তাদের আদরের লোকটিকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে না যায়। সেনাপতির ইশারায় মশক টেনে এনে ফেলা হল জলে।

১৭) মাঝরাতে খোজার বন্ধুরা এল হৌজে, সসম্মানে তাকে কবর দিতে। আঁকশি দিয়ে মশক টেনে এনে তার বাঁধন খুলল... দেখে জাফরের লাশ। তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নাসরেদ্দিন।

বললে, 'আমি বেঁচেই আছি আর দেখছ তো, কথা রেখেছি।'

...সংখ্যায় খ্যাতনামা খাজা ...দ্দিনের কিছু কীর্তি কাহিনীর ...শুনেছে আমাদের শিশু পাঠ...। 'সিয়ুজফিল্ম' স্টুডিও থেকে ...শক্তিকপাবনের আরো একটি ...দেখিয়েছে, সাহিত্যিক ল. ...সোলোভিয়েভের 'খাজা নাসরেদ্দিনের কাহিনী' বইটির দ্বিতীয় অংশ অবলম্বনে, শিল্পী—আ. ভিনোকুরভ ...র ল. শ্ভার্ৎস্মান।

চোরাক গ্রামের লোকেদের গর্ব ছিল তাদের সায়র নিয়ে। খেতে-বাগিচায় জলসেচের সময় তার নালার ফটক খোলা হত। হঠাৎ দুর্দিন এল চোরাকে। সায়র গেল লোভী আগাবেকের মালিকানায়। আগে সে ছিল কাজী, প্রচণ্ড ঘুষখোরির জন্যে চাকরি যায়। জলের জন্যে এমন খাজনা ধার্য করলে আগাবেক যে লোকের পিঠদাঁড় নুয়ে এল, হাসি-ঠাট্টাও ভুলে গেল। ঠিক করলে, সমস্ত গরিব লোকের সহায় খাজা নাসরেদ্দিনের শরণাপন্ন হবে তারা। বাগদাদের নামকরা চোরকে খুঁজে পাঠালে তার কাছে। বাগদাদের চোর তদ্দিনে ঠিক করেছিল যে সাধু জীবন যাপন করে সৎকর্মে নাম করবে। ভাগ্যক্রমে সে গিয়ে পড়েছিল চোরাক গ্রামে।

নাসরেদ্দিনের নতুন কীর্তি

বাগদাদের চোর নাসরেদ্দিনকে পেল শহরের বাজারে। সূর্য অস্ত যাবার পর ঢোল পিটিয়ে বেচাকেনা বন্ধের জানান না দেওয়া পর্যন্ত দুজনে পরামর্শ করলে। লোভী আগাবেকের কাছ থেকে সায়র ছিনিয়ে নেবার ফন্দি আঁটল তারা। আগাবেক ওদিকে মনের আনন্দেই আছে।

সময় কাটাবার জন্যে আগাবেক দিনের পর দিন চাখানায় বসে খরিদ্দারদের সঙ্গে দাবা খেলত। একদিন চাখানার খোলা দরজা দিয়ে খেলুড়েরা দেখলে এক পথিক ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে গাধা নিয়ে, পিঠে তার কোনো মালপত্তর নেই।

চাখানায় এসে পথিক কিনলে পুরো একঝুড়ি চাপাটি, আরেক ঝুড়ি খুবানি। মালপত্র নিয়ে নির্বিকার হেঁয়ালির ভাব বজায় রেখে খাজা নাসরেদ্দিন (পথিকটি) রওনা দিলে আস্তাবলের দিকে।

দরজা এঁটে বন্ধ করে সে তার গাধাটিকে খাওয়াতে লাগল চাপাটি আর খুবানি। বলতে লাগল: 'হে রাজবংশীয়, এ গ্রামে এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া গেল না। এই সামান্য খাবারের জন্যে আমায় মাপ করবেন কি?' কিছুক্ষণ পরে নাসরেদ্দিনের পেছনে খড়খড় শব্দ শোনা গেল।

চাখানার লোকদের নিয়ে আগাবেক দেখতে এসেছিল মাথা-পাগলা পথিকটা কী করে। অবাক কাণ্ড, বিচালি নয়, লোকটা কোন এক গাধাকে খাওয়াচ্ছে কিনা চাপাটি আর ফল! 'কোনো এক পাপ মতলব নেই কি এর পেছনে?' চাঁচাল কাজী আগাবেক।

কিন্তু খাজা নাসরেদ্দিন গুরুগম্ভীর চালে কৌতূহলীদের বার করে দিলে কুঁড়ে থেকে। আগাবেককে কড়া করে বললে, ওহে মান্যবর খবরদার 'গাধা' কথাটা মুখে আনবে না। পাগলা পথিক চোরাকে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ের বাস করতে লাগল তার গাধা নিয়ে।

আগাবেক দিনরাত তার ওপর নজর রাখে। দু' সপ্তাহ পরে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, লোকটা ধুনুচিতে কী-সব লতাপাতা পুড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে। আগাবেক আর পারল না, চুপি চুপি দরজা খুলল।

গাধার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লাগাম পরা দামী অলংকারে একটা লোক। পথিকের কামিজ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলছে, ওরে আলসে গোলাম, কতদিন তুই আমায় জঘন্য গাধার চামড়ায় রেখে, জঘন্য খাবার খাওয়াবি, মাঝে মাঝে মানুষ করে, টাকা চেয়ে চেয়ে কষ্ট দিবি?

'হে দিব্যদর্শন শাহজাদা, আপনি পুরোপুরি মানুষ হতে পারবেন কেবল আপনার অনুপম পিতা, মিশরের অপরাজেয় সুলতানের প্রাসাদে। আর টাকা না থাকলে মিশর পর্যন্ত যাওয়া যে অসম্ভব।' 'তাহলে দেরি করছিস কেন হতভাগা? এক্ষুনি এই জিনিসগুলো বেচে টাকা করে নে।'

শাহজাদা তরোয়াল খুলে বুকের তল থেকে থলি বার করে মাটিতে ঢেলে দিলে যত আংটি, কঙ্কণ, আর অপূর্ব এক সাতনরী হার। এত ধন দেখে আগাবেক আর পারল না, বললে: হে দিব্যদর্শন শাহজাদা, এই হতভাগা বুজরুকেটার বদলে আমি আপনাকে নিয়ে যাব মিশরে।

'উঠে দাঁড়া,' আগাবেককে বললে শাহজাদা, 'তোর মুখ দেখে আমার ভরসা হচ্ছে। তরোয়াল আর ধনরত্নগুলো নে। তুই যদি তাড়াতাড়ি আমায় মিশরে পৌঁছে দিতে পারিস, তাহলে পুরস্কার হিশেবে তোকে উজির-ই-আজম করে দেব।'

কিন্তু ব্যাঘাত ঘটাল খাজা নাসরেদ্দিন। মন্ত্র পড়তে লাগল সে, শাহজাদাও ফের ডেকে উঠল গাধার মতো। লোভী আগাবেক ভয় পেয়ে গেল যে তাকেও বোধ হয় গাধা বানিয়ে দেবে, আতঙ্কে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

যখন জ্ঞান হল, […] কুঁড়ের মাঝখানে দাঁ[…] আছে ছাই রঙের এক […] তার পায়ের […] সোনার তরোয়াল আর এ[…] রাশি অলংকার। আগাবেক তা পকেটে পুরতে পুরতে খাজাকে হুকুম করলে তক্ষুনি সে যেন শাহজাদার ইচ্ছা পূরণ করে।

কিন্তু খাজা ঘুষি বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, আর গর্দভবেশী শাহজাদা গাঁ-গাঁ করে ডাক ছাড়া, লেজ নাড়া, কান ঝাপটানো ছাড়া আগাবেকের পক্ষ নিয়ে কোনো কথাই বলতে পারল না।

এখন চালাকি করলে আগাবেক। বললে, বদলা-বদলি হোক। নাসরেদ্দিন সায়রের মালিক হয়ে চোরাকে থাকুক, আর আগাবেক নিজে ধনরত্ন তরোয়াল আর শাহজাদা গর্দভকে নিয়ে যাবে মিশরে।

পরদিন চোরাক আর আশেপাশের লোক ঘিরে ধরল সায়রের নতুন মালিককে। সায়রের নালায় কষে বন্ধ করা ফটক খাজা খুলে দিলে চাবি দিয়ে, শুকিয়ে যাওয়া খাদ বেয়ে তরতরিয়ে জল ছুটল খেতে বাগিচায়। চোরাকে বিনা খাজনায় সেচ এই প্রথম।

এই সময় নিচে, পাহাড়গুলিতে পাথুরে রাস্তায় দেখা দিল আগাবেক, মোটঘাট নিজে নিয়ে সসম্মানে গাধার পেছু পেছু সে চলেছে মিশরের দিকে।

ওদিকে গাধা আর আগাবেক মোড় নিতেই রাস্তায় দেখা দিল শাহজাদা। চুপি চুপি সে ওদের পিছু নিল। বাগদাদের চোরের আরেক বার আগাবেককে ঠকাবার ইচ্ছা আছে, ফেরত নিতে হবে নিজের ধনরত্ন আর নাসরেদ্দিনের জন্যে তার বিশ্বস্ত গাধাটি। তবে সেটা অন্য কাহিনী।

তুক করা থলে

আমাদের দেশে শতাধিক জাতি, তাদের প্রত্যেকের আছে নিজ নিজ উপকথা, কিংবদন্তি, কাহিনী। 'তুক করা থলে' নানাইংসদের রূপকথা। থাকে তারা সাইবেরিয়ার উত্তরে, বড়ো বড়ো নদী, তুন্দ্রা আর তাইগা বনের রাজ্যে। এ গল্পটি বেরিয়েছে 'মালিশ' প্রকাশভবন থেকে। ছবি এ'কেছেন শিল্পী ইয়া. মানুখিন।

এক গাঁয়ে থাকত বুড়ো-বুড়ি। তাদের দুই ছেলে — বড়োটি নাইসো, ছোটোটি বাকসু। দুই ভাই শিকার করে বেড়ায়, মাছ ধরে নদীতে। আর বুড়ো-বুড়ি হাঁড়ায় সিদ্ধ করে মাছ আর মাংস। একদিন দুই ভাই গেল নদীতে। সারা দিন ধরে চেষ্টা করে পেল শুধু একটি ছোট্ট মাছ।

মাছটা নিয়ে বুড়ি কুটতে যাবে, হঠাৎ শোনে, 'দিদিমা!' ভয় পেয়ে গেল বুড়ি। ওদিকে মাছ বলে, 'তুমি আমার আঁশগুলো ছাড়িয়ে হাঁড়ায় নুন-জল দিয়ে সেদ্ধ করো, আমায় ছেড়ে দাও নদীতে।' বুড়িও তাই করলে।

চট করেই জ্বলে উঠল শুকনো কাঠকুটো, জল ফুটে টগবগ করতে লাগল, শাদা ভাপ উঠল ঢাকনির তল থেকে। হাঁড়িতে উ'কি দিলে বুড়ি, দেখে একেবারে কানায় কানায় তা মাছে ভরা। অনেকখন অবাক হয়ে রইল বুড়ো-বুড়ি। আনন্দ করলে: রাখল আঁশ আর হয়ে গেল কিনা মাছের ঝোল। সেদিন সবাই খেলে পেট পুরে। তারপর শুতে গেল।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল বুড়োর, চোখ মেলে দ্যাখে, ঘরে আলো। নজরে পড়ল দেয়ালে টাঙানো অপরূপ এক থলি। তাতে সুন্দর নকশা বা রঙীন পু'তির সেলাই নেই বটে, কিন্তু আলো দিচ্ছে, যেন ঝরঝরে দিনের সূর্য। বুড়ো-বুড়ি বুঝল কে পাঠিয়েছে এই উপহার।

সেই দিন থেকে ভালোই দিন কাটছিল দু'ভাইয়ের। বুড়ো-বুড়িও আছে সুখে। তুক করা থলেটি তারা আগলে রাখে।

একদিন এক কুটিলা ডাইনী থলেটা নিয়ে পালাল বনে। দু'ভাই ছুটল তাকে ধরতে। ডাইনী প্রথম গাছটা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তার ডাল ভাঙল। ভাইরা কাছে আসতেই ডালটা দিয়ে বড়ো ভাইয়ের মুখে বাড়ি মেরে ডাইনী চে'চিয়ে উঠল: 'কুকুর হয়ে যা!' ছোটো ভাইকে

মেরে বললে, 'বেড়াল হ'!'

ছেলেদের জন্যে অনেক অপেক্ষা করল বুড়ো-বুড়ি। ডাকাডাকি করলে। পথ চেয়ে রইল। হঠাৎ দ্যাখে রাস্তা দিয়ে আসছে কুকুর আর বেড়াল। বুড়ো-বুড়ি ডাকে, 'নাইসো! বাকস্‌!' লেজ নেড়ে কুকুর তখন ডেকে উঠে সাড়া দিল, বুড়ো-বুড়ির পায়ের কাছে গিয়ে গা ঘষে বেড়াল। অনেক দুঃখ করলে বুড়ো-বুড়ি, তবে উপায় তো নেই।... মাছ ধরার জাল নিয়ে বুড়ো নিজেই চলে গেল নদীতে। কেননা এখন তো আর ছেলেও নেই, সাহায্য করারও কেউ নেই। ফের গরিবের মতো দিন কাটতে লাগল তাদের।

একদিন কিন্তু ছোট্ট একটা ই'দুর ধরলে বেড়াল। ই'দুর কাকুতি-মিনতি করলে 'আমায় মেরো না বাকস্‌! আমি জানি কুটিলা ডাইনী থাকে কোথায়! নখ গুটিয়ে নিয়ে বেড়াল শুধোয়, 'কী নাম তোর?' 'পিমেকেন।' 'ঠিক আছে পিমেকেন, সত্যি বলে থাকলে আমাদের বন্ধু হবি। ডাইনীকে ঠকিয়ে যদি থলেটা আনতে পারা যায়, তুই থাকবি আমাদের সঙ্গে।'

কুকুর নিয়ে সবাই রওনা দিলে দূরের পথে। আগে আগে ছোটে পিমেকেন, তার পেছনে বেড়াল আর কুকুর। যেতে যেতে দ্যাখে একটা নদী জ্বলজ্বল করছে। সাঁকোর ওপর উঠতেই চোখে পড়ল ডাইনী বসে আছে ওপারে, হাসছে: 'নমস্কার নাইসো! নমস্কার বাকসো! এবার তোদের সাবাড় করব! কুকুর ও বেড়ালকে ধরে সে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আর পিমেকেন তো ছোট্ট। ডাইনী তাকে খেয়ালই করলে না। উনুনে হাঁড়া চাপিয়ে শুয়ে পড়ল ডাইনী, পা ঠেকিয়ে রাখল চালে। এখানেই তুক করা থলে দেয়ালে টাঙানো, তার দিয়ে বাঁধা। টাঙানো খুব উ'চুতে, নাগাল পাওয়া ভার। বেড়াল আর কুকুর চেয়ে দ্যাখে, থলি থেকে চোখ আর সারাতে পারে না। হঠাৎ শোনে খড়খড় শব্দ। পিমেকেন ফাটলে ঢুকে খুলে দিল দরজা।

বেড়াল কুকুরের আনন্দ আর ধরে না। যেখানে থলে টাঙানো ছিল, গুটি গুটি গেল সেই দেয়াল-টার দিকে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল কুকুর, বেড়াল উঠল তার ওপর আর বেড়ালের ওপর পিমেকেন। বাস, শুরু হয়ে গেল তার কাটা: কুটুর কুটুর কুটুর কুটুর — খচ্‌! কেটে গেল তার। দেয়াল থেকে খসে পড়ল থলে, সারা ঘর অন্ধকার হয়ে উঠল রাত্রির মতো।

পড়তে পড়তেই থলেটাকে লুফে নিল কুকুর, লাফিয়ে গেল দরজার দিকে, তার পেছনে বেড়াল আর বেড়ালের ওপর পিমেকেন।

ধড়মড়িয়ে উঠল ডাইনী, ছুটল তাদের ধরতে। এই ধরেই ফেললে বুঝি। নদী পর্যন্ত গিয়ে বেড়াল চেপে বসল কুকুরের পিঠে, কুকুরও জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে গেল অপর পারে। ওদিকে পিমেকেন বসে আছে বেড়ালের পিঠে।

ডাইনী ছুটে এসেছিল নদী পর্যন্ত, কিন্তু কুকুর আর বেড়ালকে ধরতে পারলে না; জলে ঝাঁপ দিতেই তলিয়ে গেল।

অঘোরে ঘুমাচ্ছিল বুড়ো-বুড়ি, কখন যে কুকুর আর বেড়াল বাড়ি ফিরে মাচার ওপর শুয়েছে, তা তাদের কানেই যায় নি।

আর সকালে বুড়ো-বুড়ি ঘুম ভেঙে দ্যাখে মাচায় শুয়ে আছে দুই ভাই: বড়ো ছেলে নাইসো, ছোটো ছেলে বাকস্‌। আনন্দে কে'দে ফেললে বুড়ো-বুড়ি, জড়িয়ে ধরল ছেলেদের।

ফের আগের মতো সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগল তাদের। ভাইয়েরা শিকার করে, মাছ ধরে। বুড়ো-বুড়ি মাংস সিদ্ধ করে হাঁড়ায় আর তুক করা থলে পাহারা দেয় পিমেকেন।

কুমির-ছানা

লেখা ও আঁকা: ত. লিপাতোভা

আফ্রিকায় মস্তো নীল নদীর তীরে তিন জানলার এক বাড়িতে থাকত কুমিরেরা — কুমির-বাবা, কুমির-মা আর নির্লাচিক নামে ছোট্ট কুমির-ছানা।

সকালে বাবা, মা আর নির্লাচিক বাড়ির তিনটে জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত আর হাসত।

নির্লাচিক বলত: 'সুপ্রভাত বাবা! সুপ্রভাত মা!'

'সুপ্রভাত নির্লাচিক!' সমস্বরে জবাব দিত বাবা আর মা, তারপর মন খারাপ করে বসে থাকত তারা। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত কুমির-বাবা বলত:

'নাও হয়েছে। এখন খাবার সময়!'

এই চলত রোজ সকালে।

তারা মন খারাপ করত কারণ কুমির-বাবা, কুমির-মা আর কুমির-ছানা নির্লাচিক, সকলেই ছিল হাসিখুশি ভালো মানুষ অথচ লোকে তাদের ভাবত বদরাগী। সেই জন্যে কুমির-ছানা নির্লাচিকের বন্ধু পর্যন্ত জোটে নি, সবসময় সে খেলত একা-একা।

একদিন সকালের খাওয়ার পর নির্লাচিক জাহাজ-জাহাজ খেলছিল। নদীতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে সে বিড়বিড় করছিল আপন মনে:

'ভোঁ-ও-ও! আমি জাহাজ! চমৎকার সবুজ জাহাজটি। সবাইকে আমি জাহাজে চাপাব — জলহস্তী, বানর, কুমির-ছানা — সবাইকে।'

এখন হয়েছে কি, এক বানর-ছানা মায়ের হুকুম না নিয়েই মস্তো নীল নদীতে ভেসে যাচ্ছিল একটা কাঠের গুঁড়িতে চেপে। ভেসে যাচ্ছিল ঠিক নির্লাচিকের মুখোমুখি। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল সে:

'এই, দেখ সবাই, আমি ভেসে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো বিপদ হচ্ছে না আমার।'

কেমন সে সাহসী বানর-ছানা তা সবাইকে দেখাবার জন্যে সে লাফায় একটু উঁচুতে... আর ঋপাং করে জলে।

'ডুবে গেলুম!' আঁতকে উঠল বানর-ছানা।

'ডুবে যাবে যে!' আঁতকে উঠল নির্লাচিক। ছুটল তাকে বাঁচাতে। আঁকু-পাঁকু করে বানর-ছানা উঠল নির্লাচিকের পিঠে, সে তাকে বয়ে নিয়ে চলল তীরের দিকে।

আর তীরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বানর-মা।

'পোড়া কপাল! ছানাটি আমার ডুবতে বসেছিল, এবার এই কুচুটে দাঁতাল কুমিরটা ওকে খাবে।' ওদিকে বানরকে পিঠে করে আনতে আনতে নির্লচিক তাকে বলছিল তার জাহাজ-জাহাজ খেলার কথা। তীরে পেঁাছেই বানর-ছানা ছুটে গেল তার মায়ের কাছে:

'তোমার মত না নিয়ে মস্তো নদীতে কাঠের গুঁড়ি চেপে বেড়াতে আমি আর কখনও যাব না।'

নির্লচিক দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে। তারপর মন ভার করে বললে:

'তাহলে আমি চলি?'

'দাঁড়া' নির্লচিককে বললে বানর-ছানা। মাকে শুধোল: 'কুমির-ছানার সঙ্গে জাহাজ-জাহাজ খেলব মা, কেমন?'

মা বললে, 'ও যে কুচুটে, দাঁতাল।'

বানর-ছানা তখন নির্লচিকের হাত ধরে জোর গলায় বললে: 'না, ও ভালো। তাছাড়া মোটেই ও দাঁতাল নয়, ওর হাসিটাই ওই রকম।'

দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত নির্লচিক জাহাজ-জাহাজ খেলল বানর-ছানার সঙ্গে ও খাওয়ার পরেও অন্য জন্তু-জানোয়ারের ছানারাও খেলতে জুটল।

আর পরের দিন সকালে কুমির-ছানা নির্লচিক, কুমির-বাবা, কুমির-মা ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখল তাদের বাড়ির জানলা দিয়ে, হাসল আর সঙ্গে সঙ্গেই খেতে বসল।

পরে আর কখনও তারা মন খারাপ করে নি।

এঁকেছেন : ভ. আলেক্সেয়েভা

কী গায় ভরত পাখি

পালকের দেশে, ডানার রাজ্যে থাকত এক মহাবল ঈগল। যথাকালে, হলুদ-ঠোঁট ছানা হল তার। এমন একটা শুভদিন— পালক রাজ্যের নানা দিক থেকে সবাই উড়ে এল ঈগলের বাসায়।

'বাসাটা মেরামত করলে হয় না?' জিজ্ঞেস করলে কাঠুরে কাঠঠোকরা।

'ইঁদুর ধরা উচিত বোধহয়?' কুর্নিশ করলে ঘরকুনো প্যাঁচা।

'ঈগল ছানার আয়া চাই কি?' পা টেনে টেনে এল জলাবাসী সারস।

একের পর এক পাখিরা এল ঈগলের বাসায়। জমে উঠল উপহারের পাহাড়।

সর্বঘটের ঘটী ছাতার পাখি সবার পরিচয় দিয়ে উঠতে পারছিল না, 'দেমাকী গাঙচিল, ইনি লিকলিকে চামচিকে, উনি গম্ভীর-গম্ভীর তিতির...'

'আর এটা কে?' ছোটো একটা ধূসর গুটলির দিকে মাথা হেলাল ঈগল।

এটি ঝোপবাসী ভরতমাসি। উড়তেও পারে না।'

'তা ওর উপহারটা কোথায়?'

'আমার কিছুই নেই', ভয়ে ভয়ে চিঁচিঁ করল ভরত পাখি।

'আমি উপহার চাই', নাকি কান্না জুড়ল ঈগল-ছানা।

'কাঁদিস না, আমি তোকে বরং গান শোনাই', ভরত পাখি শুরু করল তার নিজের ঝোপটি নিয়ে গান।

'আমিও গাইব', বললে ঈগল-ছানা।

'শুনলে তো?' গোমড়া মুখে ঈগল তাকাল ভরত পাখির দিকে, 'উপহারের গাদিতে তোমার জিবটা রাখো।'

জিব দিতে ভরত পাখির কষ্ট হবেই তো। কিন্তু কী করা যায়?

'গানটা আমি শেষ করি কেমন? আমার ঝোপে এক ফোঁটা শিশিরের কথা এখনো গাওয়া হয় নি।'

'গাও, তবে চটপট।'

ঈগল ভরত পাখিকে নিয়ে উঠে গেল আকাশে, কিন্তু সেখান থেকেও শোনা গেল ভরত পাখির গান। অবাক হয়ে ঈগল তার মুঠো আলগা করে দিলে। কিন্তু ছোট্ট গাইয়ে মাটিতে পড়ল না। এখন সে তার নিজের ডানায় ভর দিয়ে গাইতে লাগল। কেবলি ওপরে উঠতে লাগল সে। গলায় এল জোর, আত্মবিশ্বাস। বনের ওপর, মাঠের ওপর, অকূল নদীর ওপর শোনা গেল সেই গান — গাইয়েকে আর দেখাও যায় না। শুধু ঝরনার মতো নির্মল কল্লোলে তা কেবলি ঝরে পড়ে পৃথিবীতে।

'কবে আমি গাইব?' ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল ঈগলছানা।

'সকাল পর্যন্ত সবুর কর', বললে পাখির রাজা, শোয়ার তোড়জোড় করতে লাগল।

কিন্তু সকালে যখন সূর্য উঠল, ঈগলের প্রথম যা কানে এল সেটা ওই ভরত পাখিরই গান। চলল তা পরের দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন... কবে ভরত পাখির গান শেষ হবে সে ধৈর্য আর রইল না ঈগলের।

সেই থেকে গ্রীষ্মের সকাল-সন্ধে মাঠ-বনের ওপর ভাসে ভরতপাখির গানের ঝঙ্কার।

ইলিয়া শুরাকো

সোভিয়েত ইউনিয়ন

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.